হজরত শাহজালাল

হযরত শাহজালাল

ও

শাহপ্রান (রহঃ)

রহমানিয়া লাইব্রেরী
৩১, নবরায় লেন, ঢাকা—১

প্রকাশনায় ঃ
কাজী আনিসুর রহমান
পোঃ তালতলা বাজার
নোয়াখালী।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত ঃ

গ্রন্থকার ঃ
আলহাজ্জ কাজী মাওলানা গোলাম রহমান

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ
১৯৭৫ মে

মুদ্রণে ঃ
শওকত জাহা খানম
শেলী প্রেস
৫৮, প্যারীদাস রোড,
ঢাকা—১

প্রাপ্তিস্থান ঃ
বাংলাদেশের সকল
সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়

বাঁধাই ঃ রকেট বুক বাইণ্ডার্স

মুল্য ঃ মূল্য ঃ দশ টাকা মাত্র

উপহার

ভূমিকা

হযরত শাহজালাল (রহঃ) লিখকের ভাষায় সিলেটের ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। কিন্তু আমরা বলিব, তিনি বঙ্গ-ভারতের মধ্য গগণে উজ্জ্বল রবি। তাঁহার দীপ্ত ধর্মালোকে আজ সমুদ্ভাসিত বঙ্গ-ভারতের সমগ্র এলাকা।

সত্যই তিনি সুফী সম্রাট, লিখক যা বলেন ধ্রুব সত্য—সাধারণ রাজা বা সম্রাটগণ রাজত্ব করেন জীবিত কালেই, তা' মৃত্যুর সাথেই শেষ। কিন্তু সুফী সম্রাটগণ রাজত্ব চালান তাঁহাদের পরলোক যাত্রার পরেও, শাহ-জালালের মাযার শরীফ ইহারই সাক্ষ্য বহনকারী। আমীর ওমারা, জ্ঞানী গুণী ও সাধারণ লোক এ মাযার শরীফে যে বিপুল ভিড় জমাইয়া থাকে তাহাতে কে বলিবে, যে ইহা কোন পরাক্রমশালী রাজ দরবার ছাড়া আর কিছু ?

তাঁর সাথে সাথে স্মরণ করিব তদীয় ভাগিনেয় হযরত শাহপ্রানের কথা, যাঁর জীবন-ঘটনা শুধু সিলেটেই নয় সারা বাংলার জন-মানুষের মুখে মুখে। তাঁর মাযারেও দেখা যাইতেছে অবিকল সেই একই দৃশ্য।

দুই মাযারে শায়িত সুফীরাজ শাহজালাল ও শাহপ্রানের জীবনালেক্ষ্য সত্যই বড় অদ্ভুত, বড় বিচিত্র, বহু কীর্তি ও সাধনা-সমৃদ্ধ এ জীবন কাহিনী। গ্রন্থকারও বড় সার্থক রূপায়ন ঘটাইয়াছেন এ জীবনীদ্বয়ের।

পুস্তক সম্পাদনায় মাওলানা মোঃ ইউনুসের ভূমিকা সত্যই স্মরণীয়।

প্রকাশক

সূচীপত্র

হযরত শাহজালাল

১। হযরত শাহজালাল (রহঃ)এর পরিচয় ... ৭
২। জন্ম ও শৈশব ৮
৩। বাঘ ও হরিণীর বিচার ১৪
৪। হিন্দুস্থান যাত্রার পূর্বে ১৯
৫। হিন্দুস্থানের পথে হযরত শাহজালাল (রহঃ) ... ২১
৬। ভক্তের দল ২৫
৭। নিযামুদ্দীন আওলিয়ার সাথে
হযরত জাহজালালের সাক্ষাৎকার ... ২৭
৮। গৌড় গোবিন্দের আমলে সিলেটের অবস্থা ... ৩০
৯। প্রতিশোধের আগুন ৩৩
১০। গৌড় গোবিন্দের সহিত সন্ধি ৩৮
১১। সেনাপতি নাসিরউদ্দিন ও শাহজালাল ... ৪১
১২। শ্রীহট্ট অভিযানে হযরত শাহজালাল ও মুসলিম বাহিনী ৪৭
১৩। রাজা গোবিন্দের সাধ ৫৪
১৪। হযরত শাহজালালের আস্তানা ৫৯
১৫। তিনশত ষাট আউলিয়ার দেশ ৬১
১৬। তরফ বিজয় ৬২
১৭। হযরত শাহজালালের ধর্মনীতি ও রাজনীতির মূলকথা ৬৫
১৮। হযরত শাহজালালের দরবারে ইবনে বতুতা ... ৬৮
১৯। হযরত শাহজালালের কয়েকজন বিখ্যাত অনুচর ৭২
২০। হযরত শাহজালালের শিষ্যবৃন্দের নাম ... ৯৮
২১। কারামাতুল আউলিয়া ১০৪

হযরত শাহপ্রান

২২।	হযরত শাহপ্রান (রহঃ)	…	…	১১৫
২৩।	সিলেটে সুফীবাদের প্রভাব	…	…	১৩৮
২৪।	সিলেটের প্রাচীন ইতিহাস	…	…	১৪৪
২৫।	প্রাচীন যুগে সিলেট	…	…	১৪৪
২৬।	তুর্কী আমলে সিলেট	…	…	১৪৬
২৭।	মোগল কর্তৃক সিলেট বিজয়		…	১৪৭
২৮।	ইংরেজ আমলে সিলেটের সামাজিক অবস্থা			১৫৩
২৯।	মোহার্রমের দাঙ্গা	…	…	১৫৬
৩০।	সিপাহী বিদ্রোহ ও লাতুর লড়াই		…	১৫৭
৩১।	সিলেটে ধর্মীয় আন্দোলন	…	…	১৫৮
৩২।	খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন		…	১৫৯

بسم الله الرحمن الرحيم

হযরত শাহজালাল (রহঃ)এর

পরিচয়

হযরত শাহজালাল সিলেটের ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। যুগ যুগ ধরিয়া মানব মনে এই নামটি অক্ষয় হইয়া আছে, আজও লোকেরা হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত ভক্তির আবেগে এই নামটি স্মরণ করিয়া থাকে। বস্তুতঃ প্রকৃত মানুষ তাহারাই, যাহারা মৃত্যুর পরেও মানব মনে অবিস্মরণীয় হইয়া থাকে। আদি মানব হযরত আদম (আঃ) হইতে আজ পর্যন্ত কোটি কোটি মানুষ পৃথিবীতে আসিয়াছে, নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত পৃথিবীর আলোবাতাস গ্রহণ করিয়া আবার তাহারা চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু ইতিহাসের পাতায় তাহাদের সকলের স্থান হয় নাই। না হওয়ার কারণ—ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য তাহারা কোন অবদান রাখিয়া যান নাই।

হযরত শাহজালাল (রহঃ) ছিলেন এই সব সাধারণ লোকের বহু উর্দ্ধে। তাঁহার আদর্শ, ধর্মনিষ্ঠা, সততা, সমাজসেবা ও সর্বোপরি তাঁ'র আধ্যাত্মিক সাধনার যে অপূর্ব দৃষ্টান্ত তিনি রাখিয়া গিয়াছেন তাহাই তাঁহাকে অবিস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন একজন ফকীর মাত্র, দীন দুঃখীর মতই ছিল তাঁহার জীবন-ধারণ ব্যবস্থা, অথচ সাধনা জগতে তাঁ'র স্থান ছিল বহু উর্দ্ধে, সেখানে তিনি ছিলেন বাদশাহ।

আসিয়াছিলেন। কারণ ব্যবসায়ই ছিল আরবদের জীবিকার্জনের একমাত্র পথ।

শিশু শাহজালালের বয়স যখন তিনমাস, সেই সময় একদিন তাঁহার পরম শ্রদ্ধেয়া জননী জগতের সকল মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়া জান্নাতবাসিনী হন। বর্তমানের দুগ্ধপোষ্য শিশু এবং ভবিষ্যতের তাপসকুল শ্রেষ্ঠ মহামানবকে আল্লাহ এইভাবে মাতৃহারা করিলেন। তাঁহাকে বুঝিতেও দিলেন না যে, জগতে মতৃস্নেহ কত বড় নেয়ামত এবং তাহার বন্ধনই বা কত অটুট! রহিয়া গেলেন পিতা; কিন্তু আল্লাহ্র তাহাও মনঃপুত হইল না। যাহাকে তিনি একান্ত আপন করিয়া লইবেন তাহাকে পার্থিব মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ রাখিলে চলিবে কেন? সংসারের সকল বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া তাঁহাকে অনন্ত প্রেমের পথে চালনা করাই যে তাঁহার কর্তব্য। হযরত শাহজালালের পিতা জেহাদের আহ্বানে কোন এক ধর্মযুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। জেহাদের ডাক মুসলমানদের মনে কি যে অপূর্ব প্রেরণা যোগায়, তাহা বলার আবশ্যক নাই। জীবিত ফিরিয়া আসিলে গাযীর সম্মান, নিহত হইলে নিশ্চিত শাহাদাত প্রাপ্তি, বিনা হিসাবে বেহেশত লাভের গৌরব। এ দু'টি বস্তুই মুসলমানদের কাম্য এবং ইহাই তাহাদিগকে জেহাদের প্রতি পাগল করিয়া তোলে। হযরত শাহজালালের পিতা সেই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া অশেষ বীরত্বের সহিত লড়াই করিতে করিতে শাহাদাত বরণ করিলেন। পিছনে পড়িয়া রহিল নবজাত শিশু ভবিষ্যৎ বংশধরদের নূতন পতাকাবাহীরূপে, নূতন আলোকে পুরাতন সত্যসনাতন পথের সন্ধান দিতে।

পিতৃ-মাতৃহারা শিশুর শেষ অবলম্বনটুকুও যখন আর রহিল না তখন তিনি মাতুলালয়ে নীত হইলেন। তাঁহার মামা সৈয়দ আহমদ কবীর মস্ত বড় আলেম ছিলেন। সাধনা জগতেও তাঁ'র স্থান ছিল অতি উচ্চে। তিনি এই ভাগিনেয়টিকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং সর্বদা তাহাকে কাছে কাছে রাখিতেন। হয়ত সৈয়দ আহমদ কবীর

হয়ত দিব্যদৃষ্টিযোগে দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, কালে এই শিশু একজন মস্তবড় সাধক ও সংস্কারক হইবে, তাই তিনি তাহার শিক্ষার ভার অন্য কাহারও হাতে ন্যস্ত না করিয়া নিজেই গ্রহণ করিলেন।

তখনকার দিনে শিক্ষার্থীকে সর্বাগ্রে কোরআন পাঠ শিক্ষা দেওয়া হইত। কারণ কোরআন শরীফই মুসলমানদের সকল জ্ঞানের উৎস। বস্তুতঃ বর্তমান যুগেও বিভিন্ন মাদ্রাসা ও অন্যান্য ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে যত বিষয় পড়ানো হয় তাহার মূল কোরআন। নহু, ছরফ, মান্‌তেক্‌, হেকমত, বালাগাত, তাফসীর, হাদীছ ইহা সবই কোরআন হইতেই উদ্ভূত। তাফসীরতো কোরআনেরই ব্যাখ্যা। হাদীছ রসূলুল্লাহ (সাঃ)এর মুখনিঃসৃত বাণী হইলেও উহাও কোরআনের ব্যাখ্যা। কোরআন মজীদের আদেশ নিষেধ কি ভাবে পালন করিতে হইবে, কি ভাবে তদনুযায়ী নিজ ব্যক্তি জীবন, সামাজিক জীবন ও রাষ্ট্রিয় জীবন গড়িয়া লইবে ইহাই তাহাতে পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে। সুতরাং উহাও কোরআনের ব্যাখ্যা।

বালক শাহজালালকে তাই সর্বাগ্রে কোরআন মজীদ শিক্ষা দেওয়া হইল। তিনি অত্যন্ত ধী-শক্তি সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার প্রখর মেধা ও শিক্ষার প্রবল আগ্রহ দেখিয়া সৈয়দ আহমদ কবীর তাঁহাকে অধিকতর শিক্ষাদানে আগ্রহী হইলেন। বুদ্ধিমান বালক এ সুযোগ ছাড়িলেন না। তিনিও পূর্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগ ও প্রবল আগ্রহ সহকারে অধ্যবসায় আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং অত্যল্প-কালের মধ্যে কোরআন, হাদীছ, ফেকাহ্‌ ইত্যাদি শাস্ত্রে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। কিন্তু—

এত জ্ঞান অর্জন করা সত্ত্বেও তিনি পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না। যতই তিনি জানিতে চাহেন, জানার আকাংখা যেন ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অনেক জানিয়াও যেন কিছুই জানিতে পারেন নাই এমনি এক ভাব তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন। জ্ঞানাভাব তাহাকে বড়ই বিচলিত ও অস্থির করিয়া তুলিল।

যাহারা সত্যিকার ওলী, জগতের যাহারা শিক্ষাগুরু, তাহারা শিক্ষার্থীর মুখাবয়ব দেখিয়া তাহার চিত্তের অবস্থা অনেকটা উপলব্ধি করিতে পারেন। হযরত সৈয়দ আহমদ (রহঃ) নিজে আল্লাহর ওলী ছিলেন। তিনি দিব্যদৃষ্টির দ্বারা এই প্রিয় ভাগিনেয়টির অন্তর্জ্বালা জানিতে পারিলেন। তাই একদা তিনি তাহাকে কাছে বসাইয়া অতি সোহাগ ভরে বলিলেন—

"বাবা! আমার মনে হয়—তুমি নিজেকে বড় অভাবগ্রস্ত মনে করিতেছ। এবং তা'র কারণ আন্দাজ করাও আমার পক্ষে খুব কঠিন নয়। সত্যিই তুমি অভাবগ্রস্ত। যে তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করিলে চিত্তে শান্তি আসে, অন্তর পরিতৃপ্ত হয় তাহা এখনো তোমাকে শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। এবং এইজন্যই তুমি অস্থিরতা অনুভব করিতেছ। এতদিন তুমি শুধু দুগ্ধ নিয়াই সাধনা করিয়াছ, কিন্তু সেই দুগ্ধ হইতে যে সব উপাদেয় মিষ্টান্ন তৈয়ার হয় তাহার সন্ধান এখনও পাও নাই, আর সেই সন্ধান না পাওয়া অজানা উপাদেয় মিষ্টান্নের জন্যই তোমার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। আস! এবার তোমাকে সেই শিক্ষাই দান করিব।

—হযরত শাহজালাল তখনও তরুণ বয়সের। এই বয়সে সাধারণ তরুণদের মধ্যে সচরাচর তারুণ্যের উচ্ছ্বাস দেখা যায়। হাসি তামাসা, দৌড় ঝাপ, নর্তন কুর্দন ইত্যাদি নিয়াই তাহারা ব্যস্ত থাকে। কিন্তু হযরত শাহজালাল ও সবের ধারে কাছেও গেলেন না। তারুণ্যের উচ্ছ্বাস তাঁহার ছিল, যৌবনের উন্মাদনাও ছিল, কিন্তু সে উচ্ছ্বাস ও উন্মাদনাকে তিনি সংযম ও খোদাভীরুতার রশি দিয়া বন্ধন করিলেন ও তাহাকে উচ্চমার্গের জ্ঞানান্বেষণে নিয়োজিত করিলেন। তিনি শ্রদ্ধাস্পদ মামার নিকট এলমে মা'রেফাতের দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

সাধনা আরম্ভ হইল। এ সাধনার রূপ ভিন্ন। শিক্ষার্থীরা অধ্যয়ন করে। পরীক্ষা পাসের জন্য তাহারা দিনের পর দিন, রাতের

পর রাত কঠোর পরিশ্রম করিয়া পড়া মুখস্ত করে। উহা যেমন নিরস, তেমনই বিরক্তিকর। তবুও আনন্দ আছে। সে আনন্দ পরীক্ষা পাসের। পরীক্ষায় কৃতকার্য হইলে সে নিজের শ্রম সফল হইয়াছে মনে করে এবং তাই আবারও সে সেই নিরস বইগুলির পাঠ মুখস্থ করিতে লাগিয়া যায়। কিন্তু এ সাধনা অন্য রকম। এখানে নিরস বই মুখস্থ করিতে হয় না। বরং পুস্তকে যাহা কিছু পাঠ করিয়াছে তাহার নির্যাস বাহির করিয়া উপভোগ করিবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকিতে হয়। এ সাধনা পূর্বোক্ত সাধনা অপেক্ষা কঠোর হইলেও উহার আনন্দ সাথে সাথে পাওয়া যায়। পরীক্ষায় পাস করা পর্যন্ত বসিয়া থাকিতে হয় না। পাক কালাম মজীদে এরশাদ হইয়াছে—"আলা বি যিক্‌রিল্লাহি তাত্ব্‌মাইন্নুল ক্বুলুব" "মনে রাখিও—আল্লাহর যিক্‌রে অন্তর সমূহ পরিতৃপ্ত হয়। এ সত্য বাস্তব। বহুজন কর্তৃক পরীক্ষিত।

হযরত শাহজালাল একাগ্র সাধনায় মনোনিবেশ করিলেন। অন্তরের আয়না পূর্ব হইতেই পরিষ্কার ছিল। মা'রেফাত সাধনায় এবার তাহা অধিকতর পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এতদিন বোযর্গ মামার সাহচর্যে থাকিয়া লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, অন্তরে বাহিরের কলুষতার ছাপ লাগিতে পারে নাই। তাই মা'রেফাত সাধনায় লিপ্ত হওয়ার পর অত্যল্প কালের মধ্যেই তিনি কামালিয়াত হাসিল করিয়া ফেলিলেন। অন্তরে ঐশী প্রেম স্থায়ী হইল, নূরানী আলোক রশ্মিতে অন্তর প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, তিনি কামেল ওলী হইলেন।

হযরত সৈয়দ আহমদ কবীর (রহঃ) প্রিয় দর্শন এই ভাগিনেয়টির আশাতীত উন্নতিতে অতিশয় পুলকিত ও আনন্দিত হইলেন। তিনি কায়মনোবাক্যে আল্লাহর কাছে মুনাজাত করিলেন—প্রভুহে! তাহাকে তোমার প্রিয়জনদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লও, তোমার সেবায় তাহাকে নিয়োজিত কর, সে যেন অনুক্ষণ তোমার কাজে ও তোমার

চিন্তায় লিপ্ত থাকে। তাহাকে জগৎবরেণ্য কর। পার্থিব আসক্তি হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে সমাজ সংস্কারের কাজে নিয়োজিত কর। আমীন!

বাঘ ও হরিণীর বিচার

হসরত শাহজালাল (রহঃ) কামালিয়াতের চরম সোপানে পৌঁছিলেন, কিন্তু তখনও তাঁহার পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় নাই। দীক্ষাগুরু হযরত সৈয়দ আহমদ কবীর (রহঃ) তাই মনে মনে তাঁহার পরীক্ষা গ্রহণ করিবার অপেক্ষায় রহিলেন। খোদার মহিমা! সে সুযোগও আসিয়া গেল।

হযরত সৈয়দ আহমদ কবীরের বাসস্থান ছিল পবিত্র মক্কা মোয়াজ্জমায়। পিতা ও মাতার ইনতেকালের পর হযরত শাহজালাল মাতুলালয়ে থাকিয়াই লালিত পালিত হইয়াছিলেন। লেখাপড়া ও আধ্যাত্মিক সাধনাও এখানে বসিয়াই সমাপ্ত হইয়াছিল, একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এবার পরীক্ষা—সেই পরীক্ষাই তাঁহাকে দিতে হইল।

মক্কার অদূরবর্তী এক জংগলে একটি বাঘ একটি হরিণীকে তাড়া করিল। হরিণীটি উপায়ন্তর না দেখিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে হযরত সৈয়দ আহমদ কবীরের নিকট ছুটিয়া আসিল ও বাঘটির বিরুদ্ধে তাঁহার নিকট অভিযোগ দায়ের করিয়া বিচার প্রার্থনা করিল। হযরত সৈয়দ আহমদ কবীর তাহার সকল ঘটনা শুনিয়া হযরত শাহজালালের নিকট উহার বিচার ভার অর্পণ করিলেন। গুরুর আদেশ পাইয়া তিনি সেই জংগলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এদিকে হযরত সৈয়দ আহমদ কবীর মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, কিভাবে এই বাঘটিকে শাস্তি দেওয়া যায়। একবার খেয়াল হইল—"যদি

তাহাকে ডাহিন হাতের তিন ও বাম হাতের দুই অঙ্গুলি দিয়া চপেটাঘাত করা যায় তবেই তাহার উপযুক্ত শাস্তি হয়।" হযরত শাহজালাল দিব্যজ্ঞান বলে গুরুর মনের কথা জানিতে পারিলেন। তিনি বাঘটিকে ডাকাইয়া আনিলেন ও তাহাকে ডাহিন হাতের তিন ও বাম হাতে দুই অংগুলি দিয়া চপেটাঘাত করতঃ তাড়াইয়া দিলেন।

বিচার কার্য শেষ করিয়া হযরত শাহজালাল গুরুর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। গুরু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—বাঘটিকে কি শাস্তি দিয়াছ? তদুত্তরে হযরত শাহজালাল সকল ঘটনা খুলিয়া বলিলেন। শুনিয়া হযরত সৈয়দ আহমদ কবীর কোন কথা বলিলেন না কিন্তু মনে মনে ভারী উৎফুল্ল হইলেন। ভাবিলেন, কামালিয়াতে তাহার চরম উন্নতি ঘটিয়াছে। এবার তাহাকে কাজের দায়িত্ব দেওয়া যায়। কিন্তু কি কাজের ভার দিবেন—সে সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন না।

—বর্ণিত ঘটনাটি কে কতদুর বিশ্বাস করিবেন তাহা তাহার বিশ্বাসের জোরের উপর নির্ভর করে। যাহারা উহাকে নিছক গল্প বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিবেন, তাহারা হয়ত বলিবেন যে, (১) হরিণ ও বাঘ বন্য পশু। মানুষের মত তাহাদের সামাজিক বিধিবদ্ধ কোন আইন নাই, সুতরাং এস্থলে যদি বাঘ হরিণীকে তাড়া দিয়াই থাকে তবে সে তাহার হিংস্র স্বভাবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ক্ষুধা নিবারণ করিতেই চাহিয়াছে। ইহা তাহার স্বভাব। এজন্য তাহার বিচার করা চলে না। (২) হরিণ বন্যপশু। তাহার ভাষা মানুষের অবোধ্য। এস্থলে সে হযরত সৈয়দ আহমদ কবীরের কাছে কিই বা বলিল এবং তিনি কিই বা বুঝিলেন? (৩) বাঘ হিংস্র জন্তু। মানুষের চাইতে তাহার শক্তি অনেক বেশী। সুতরাং হযরত শাহজালাল (রহঃ) তাহাকে চপেটাঘাত করিলেন কিরূপে? বলা বাহুল্য, এগুলি মানুষের স্বভাবসুলভ যুক্তির প্রশ্ন। অর্থাৎ প্রকৃতির চিরন্তন নিয়মানুযায়ী মানুষ যাহা দর্শন করিয়া আসিয়াছে এবং তাহার ফলে

যে জ্ঞান তাহার সঞ্চিত হইয়াছে ইহা সেই জ্ঞানোদ্ভূত প্রশ্ন। আমরা উহাকে দোষের বলি না। কিন্তু মানুষের চিন্তা করিয়া দেখা দরকার যে, তাহার জ্ঞানের পরিধি কতটুকু? মানুষ দর্শন, শ্রবণ ও অনুভূতির সাহায্যে যে জ্ঞানলাভ করে তাহাই কি ধ্রুব সত্য? তাহার বাহিরে কি কিছুই নাই? আছে। কিন্তু তাহা জানিতে হইলে শক্তিশালী অন্তরের দরকার। আধ্যাত্মিক সাধনা দ্বারা যদি অন্তরে প্রবল শক্তি সঞ্চয় করা যায় তবে শুধু বাঘ কেন, দুনিয়ার সকল হিংস্র জন্তুই তাহার কাছে নতি স্বীকার করিতে বাধ্য। ও সময় কোন কিছু বুঝিবার জন্য তাহার ভাষার দরকার হয় না, দেখিবার জন্য চক্ষুরও দরকার হয় না বা শুনিবার জন্য কানেরও প্রয়োজন পড়ে না। অন্তর্দৃষ্টি, অন্তরের কান ও অন্তরের ভাষাই তাহাকে দেখিতে, শুনিতে ও বুঝিতে সাহায্য করে। বাকী একথা সত্য যে, পশুরা একে অপরের প্রতি অন্যায় করিলে মানুষের সামাজিক আইনে বা শরীয়তের আইনে তাহাদের বিচার করা চলে না। কারণ উহারা শরীয়তী বা সামাজিক আইনের আওতাধীন নহে। তবুও হযরত সৈয়দ আহমদ কবীর (রহঃ) হরিণী ও বাঘের মোকদ্দমা গ্রহণ করিয়া বাঘকে শাস্তি দিলেন কেন? সে প্রশ্নের জবাব এই যে, আল্লাহর ওলীগণ এল্হাম যোগে মাঝে মাঝে আল্লাহর তরফ হইতে এমন এমন আদেশও প্রাপ্ত হন, যাহার কারণ খুঁজিয়া বাহির করা আমাদের মত সাধারণ মানুষের কাজ নহে। অথচ উহার মধ্যে কোন না কোন মুস্লিহাত অবশ্যই বিদ্যমান থাকে। উদাহরণ স্বরূপ হযরত খেযের ও মূছা (আঃ)এর কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। হযরত খেযের (আঃ) বাতেনী বিদ্যায় ও মুছা (আঃ) যাহেরী বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। অতঃপর যখন আল্লাহ তাআলা কর্তৃক আদেশ প্রাপ্ত হইয়া হযরত মূছা (আঃ) হযরত খেযের (আঃ)এর সঙ্গী হইতে চাহিলেন তখন হযরত খেযের (আঃ) বলিলেন, আপনি আমার সহিত ধৈর্যধারণ করিয়া থাকিতে পারিবেন না। কারণ, আল্লাহ আমাকে যে জ্ঞানদান করিয়াছেন তাহা আপনি প্রাপ্ত

হন নাই। সুতরাং অজানিত বিষয়ে ধৈর্যরক্ষা করা আপনার পক্ষে অসম্ভব হইবে। কিন্তু মুছা (আঃ) তবুও তাঁহাকে ছাড়িলেন না। অগত্যা হযরত খেযের (আঃ) রাজী হইলেন, এই শর্তে যে, হযরত মুছা (আঃ) তাঁহাকে যাহা করিতে বা বলিতে দেখিবেন সে বিষয়ে প্রকাশ না করা পর্যন্ত কোন প্রশ্ন করিতে পারিবেন না।

অতঃপর উভয়ে পথ চলিতে লাগিলেন। এক জায়গায় নদী দেখা গেল। একজন গরীব মাঝি পথিকদের পার করিয়া দিতেছিল। হযরত মুছা ও খেযের (আঃ) উহাতে চড়িলেন। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর হযরত খেযের (আঃ) একখানা কুঠার দিয়া নৌকার এক জায়গায় ছিদ্র করিয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া হযরত মুছা (আঃ-এর আর বরদাশত হইল না। তিনি বলিয়া উঠিলেন, আপনি একি করিলেন? বেচারা আমাদিগকে নদী পার করিয়া দিল, আর আপনি তাহার ক্ষতি করিলেন? হযরত খেযের (আঃ) বলিলেন, এই ত আমি বলি নাই যে, আপনি আমার সহিত থাকিতে পারিবেন না। হযরত মুছা (আঃ) তখন নিজের দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিলেন। নদী পার হইয়া তাহারা আবার সামনে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে দেখিলেন, কতগুলি বালক একসাথে খেলা করিতেছে। হযরত খেযের (আঃ) উহার একটি বালককে ধরিয়া আনিয়া হত্যা করিলেন। তদ্দর্শনে হযরত মুছা (আঃ) আর ধৈর্যরক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি গোস্বাভরে বলিয়া উঠলেন, আপনার এ কাজ নিতান্তই গর্হিত। একটি নিরপরাধ বালককে কি জন্য আপনি হত্যা করিলেন? হযরত খেযের (আঃ) বলিলেন, আমি পূর্বেই বলিয়াছিলাম আমার সাথে ধৈর্যধারণ করিয়া থাকা আপনার পক্ষে সম্ভব হইবে না। হযরত মুছা (আঃ) তখন বলিলেন, এবারের মত আমাকে ক্ষমা করুন। ইহার পরে যদি আর কোন বিষয়ে আমি আপনাকে প্রশ্ন করি, তবে আমাকে আপনার সাহচর্য হইতে দূরে সরাইয়া দিবেন। তাহাতে আমার আপত্তি থাকিবে না।

অতঃপর তাহারা উভয়ে আবার পথ চলিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে উভয়ে তাহারা ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। প্রচণ্ড ক্ষুধা মুছা (আঃ)কে কাবু করিয়া ফেলিয়াছিল। তিনি বলিলেন, আর পারা যায় না। চলুন, এই গ্রামবাসীর নিকট গিয়া আমরা খাদ্য প্রার্থনা করি। অতঃপর তাহারা উক্ত গ্রামে পৌঁছিয়া তথাকার অধিবাসীদের নিকট খাদ্য প্রার্থনা করিলেন. কিন্তু কেহই তাহাদিগকে এক মুঠি অন্ন দিতে স্বীকৃত হইল না। ফিরিবার পথে এক জায়গায় একটি ভাঙ্গা প্রাচীর দর্শন করিয়া হযরত খেযের ও মুছা (আঃ) বহু কষ্টে তাহা মেরামত করিয়া দিলেন, কিন্তু মালিকের নিকট কোনরূপ পারিশ্রমিক দাবী করিলেন না। হযরত মুছা (আঃ) বলিলেন, আপনি ইচ্ছা করিলেই তো উহার মালিকের নিকট পারিশ্রমিক দাবী করিতে পারেন, নতুবা খামাখা আমরা এত পরিশ্রম করিলাম কেন? শুনিয়া হযরত খেযের (আঃ) বলিলেন, এই আপনার শেষ প্রশ্ন। আপনার কথানুযায়ী এবার আর আপনি আমার সঙ্গী হইবার দাবী করিতে পারেন না। এবার আসুন, যে সব বিষয়ে আপনি কৌতুহল দমন করিতে পারেন নাই, তাহা বিশ্লেষণ করি।

১ম—নদী পার হওয়াকালে যে নূতন নৌকাখানায় আমরা আরোহণ করিয়াছিলাম উহা ছিল একজন গরীব মাঝির, অথচ ঐ সময় তাহার পশ্চাদ্দিক হইতে একজন সামন্তরাজ এদিকে আসিতেছিল, সে ঐ নৌকাখানা তাহার নিকট হইতে জবরদস্তিপূর্বক কাঁড়িয়া লইত। তাই উহাকে আমি ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া দিয়াছিলাম যেন সে উহা ভাঙ্গা দেখিয়া আর সে দিকে দৃষ্টিপাত না করে।

২য়—যে বালকটিকে আমি হত্যা করিয়াছিলাম, তাহার পিতা ও মাতা উভয়ে অত্যন্ত নেককার ও পরহেযগার ছিল। বড় হইলে এই বালক কাফের হইত এবং সে তাহাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করিত। আর যেহেতু সন্তানের প্রতি পিতা মাতার স্নেহ অত্যন্ত প্রবল থাকে, তাই স্বাভাবিক কারণেই তাহারা তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিত

না, ফলে তাহাদের ঈমানে শৈথিল্য দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল। আর ঠিক এইজন্যই আমি তাহাকে হত্যা করিয়াছি।

আপনার সর্বশেষ প্রশ্ন যে, এত কষ্ট স্বীকার করিয়া প্রাচীরটি মেরামত করিয়া দিয়াও কেন আমি উহার মালিকের নিকট হইতে পারিশ্রমিক দাবী করিলাম না, উহার কারণ এই যে, প্রাচীরটির মালিক দুইজন ইয়াতীম বালক। মৃত্যুর পূর্বে তাহাদের পিতা-মাতা তাহাদের জন্য কিছু ধন সঞ্চয় করিয়া এই প্রাচীরের মধ্যে রাখিয়া গিয়াছিল। প্রাচীরটি ভাঙ্গিয়া পড়িলে সে গুপ্ত ধন বাহির হইয়া পড়িত। ফলে উহা আর তাহাদের হস্তগত হইত না। এইজন্যই আমি বিনা পারিশ্রমিকে উহা মেরামত করিয়া দিয়াছি। আর শুনুন! এই কাজগুলির কোনটিই আমি নিজের ইচ্ছায় করি নাই। মহান আল্লাহই আমাকে উহা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। আমার যা'কিছু জ্ঞান তাহা তিনিই দান করিয়াছেন।

ইহা পাক কালাম মজিদে বর্ণিত সত্য ঘটনা, যাহাতে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। হযরত সৈয়দ আহমদ কর্তৃক হরিণীর মোকদ্দমা গ্রহণ ও হযরত শাহজালাল কর্তৃক ব্যঘ্রকে শাস্তিদানের ঘটনাটিও অনুরূপ ভাবে বিচার করিলে আর কোন সন্দেহ থাকে না। আল্লাহর ওলিগণ কর্তৃক মাঝে মাঝে এইরূপ অলৌকিক ঘটনা প্রকাশিত হওয়া বিচিত্র নহে। আমাদের কাছে উহা অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইলেও উহাতে সন্দেহ পোষণ করা উচিত নহে।

হিন্দুস্তান যাত্রার পূর্বে

পরীক্ষা শেষ হইল। গুরুর নিকট হযরত শাহজালাল 'কামেল' বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিলেন। এবার তাঁহাকে কর্মক্ষেত্রে যাইতে হইবে। কিন্তু কি কাজ তাঁহাকে দেওয়া যায় এবিষয়ে হযরত সৈয়দ আহমদ কবীর চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে একদিন হযরত শাহজালাল (রহঃ) একটি খাব দেখিলেন। কে যেন তাঁহাকে বলিতেছে, 'হে শাহজালাল, তোমার সাধনা, তপস্যা ও আত্মসংযমে আল্লাহ তাআলা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি তোমাকে তাঁ'র প্রিয় বান্দাদের মধ্যে গণ্য করিয়া লইয়াছেন। হিন্দুস্তানের ভার তোমাকে দেওয়া হইল। তথাকার মানুষ পৌত্তলিকতার দোষে কুলষিত। তাহারা নানারূপ কুসংস্কার ও পাপ কার্যে মত্ত রহিয়াছে। পরম করুণাময় মহান আল্লাহকে ভুলিয়া তাহারা নিজেদের খেয়াল খুশীমত দেব-দেবীর পূজা করিয়া চলিয়াছে, তাই অবিলম্বে তুমি সেখানে গমন কর ও বিভ্রান্ত মানুষকে ইসলামের জ্যোতিতে জ্যোতিস্মান করিয়া আবার তাহাদিগকে আল্লাহর সহজ সরল পথে প্রতিষ্ঠিত কর।

হযরত শাহজালাল আশ্চর্যান্বিত হইলেন। একি নিছক স্বপ্ন? না, প্রত্যক্ষ আদেশ? কালবিলম্ব না করিয়া তিনি গুরুর নিকট গমন করিলেন ও তাঁহাকে স্বপ্নের আদ্যোপান্ত বিস্তারিত ভাবে শুনাইলেন। হযরত সাইয়েদ আহমদ কবীর (রহঃ) বলিলেন, বাবা! তোমার জন্য সুসংবাদ। ইহা নিছক স্বপ্ন নয় বরং পরোক্ষ আদেশের মাধ্যমে আল্লাহপাক তোমাকে হিন্দুস্থানের দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন। ভালই হইল, তোমাকে কোন্ কাজে নিয়োজিত করা যায় সে সম্পর্কে আমিও বহুদিন যাবৎ চিন্তা করিয়া আসিতেছিলাম। খোদাকে ধন্যবাদ তিনিই ব্যাপারটিকে খোলাসা করিয়া দিলেন। যাও! আর দেরী নয়। অবিলম্বে হিন্দুস্তান যাত্রা কর এবং তথাকার অধিবাসীদিগকে পৌত্তলিকতা হইতে বিমুক্ত করিয়া সেখানে ইসলামের বিজয় পতাকা উত্তোলন কর।

হিন্দুস্তান! কে জানে পৃথিবীর কোন সীমান্তে সে দেশ? সেখানকার আবহাওয়া, পরিবেশ কোনটিরই সহিত তিনি পরিচিত নহেন। তবুও যাইতে হইবে এবং সে যাওয়ায় কোন ভুল নাই। হযরত শাহজালাল হিন্দুস্তানের পরিচয় জানিবার জন্য উদগ্রীব

হইলেন। দীক্ষাগুরু হযরত সাইয়েদ আহমদ কবীর হয়ত বা তাহার মনের কথা জানিতে পারিলেন। তিনি এক মুঠি মাটি তুলিয়া লইয়া বলিলেন, চিন্তা কি বাবা! যাও! এই মৃত্তিকাটুকু সাথে রাখ! এই মাটির অনুরূপ বর্ণ ও গন্ধবিশিষ্ট মাটি যেখানে পাইবে, মনে করিবে সেইটিই তোমার কর্মস্থল, সেখানেই আস্তানা গাড়িয়া তুমি কাজে লাগিয়া যাইবে। যাও বাবা! তোমাকে আমি আল্লাহর হাতে ন্যস্ত করিলাম। তিনিই তোমাকে সর্বাবস্থায় সাহায্য করিবেন।

হিন্দুস্তানের পথে হযরত শাহজালাল (রহঃ)

জন্মভূমি! সে যে কত বড় আকর্ষণের, তাহা বলিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। হৃদয়ের প্রতিটি তন্ত্রীর সহিত উহার সম্বন্ধ। দেহের প্রতিটি অনুকণার সহিত উহার যোগসূত্র। কিন্তু আকর্ষণ যত গভীরই হউক, আল্লাহর আদেশের মোকাবিলায় উহার কোন মূল্য নাই। তাই হযরত শাহজালাল (রহঃ) চিরতরে জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করিয়া হিন্দুস্তানের পথে পাড়ি জমাইলেন।

হযরত শাহজালালের হিন্দুস্তান যাত্রার কথা শুনিয়া বারজন দরবেশ তাঁহার সঙ্গী হইল। বলাবাহুল্য, কামেল ওলী বলিয়া ইতিপূর্বেই তাঁহার নাম চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু কামেল ওলীর তাহাতে কি আসে যায়! তাঁহার নামের কোন প্রয়োজন নাই। আল্লাহর আদেশ পালনই তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। হযরত শাহজালাল (রহঃ) এই বারজন আওলিয়াকে সাথে নিয়াই যাত্রা করিলেন।

হযরত শাহজালাল (রহঃ) সর্বাগ্রে ইয়ামন ছফর করিলেন। কারণ, উহা ছিল তাঁহার পিতৃপুরুষদের আদি বাসস্থান। ঐসময় ইয়ামনের সর্বময় কর্তৃত্ব যা'র হাতে, তিনি ছিলেন একজন সুচতুর রাজনীতিজ্ঞ। ছলে-বলে কৌশলে শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগত করিয়া

রাখিবার নীতিই ছিল তাহার শাসনতন্ত্রের মূল কথা। দেশের মধ্যে অবাধে মারামারি, কাটাকাটি, খুনাখুনি চলিত কিন্তু বাদশাহর তাহাতে কোনরূপ মাথাব্যথার কারণ ছিল না। মদ্যপান, জুয়া, ব্যভিচার ইত্যাদির কারণে দেশে দারুণ অরাজকতা দেখা দিয়াছিল, রাহাজানি ছিল সেখানে নিত্তনৈমিত্তিক ব্যাপার; কিন্তু বাদশার সেদিকে আদৌ ভ্রুক্ষেপ ছিল না। অনাচার অবিচারে গোটা দেশের অবস্থা যখন এইরূপ তখনই হযরত শাহজালাল আকস্মিক ভাবে সেখানে গমন করেন। তাঁহার আগমন বার্তা শুনিয়া একদল সত্যান্বেষী লোক যখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিল, তখন বাদশাহ মহা ভাবনায় পড়িয়া গেলেন। কি জানি কোথাকার বাতাস কোথায় গিয়া দাঁড়ায়। যদি তিনি সত্যিকার ওলী হইয়া থাকেন তবে প্রজাবৃন্দ তাঁহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে পারে। এমতাবস্থায় হয় তাহাকে ধর্মপরায়ণ হইয়া ন্যায়ের ভিত্তিতে রাজ্য চালাইতে হইবে না হয় তাহাকে পদত্যাগ করিতে হইবে। অন্যায় ভাবে কোন কিছুই করা চলিবে না।

বাদশাহ চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি ভাবে এই দরবেশকে চিরতরে খতম করা যায়। তিনি চিরাচরিত স্বভাবানুযায়ী ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কপট সাধু সাজিয়া সভাসদবৃন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, দেখ! জীবনে আমি শুধু পাপই অর্জন করিয়াছি। পুণ্যের খাতায় আমার কিছুই নাই। জীবনের এই শেষ প্রান্তে পৌঁছিয়া আমার দারুণ ভয় হইতেছে। না জানি মহান আল্লাহ আমার জন্য কি শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন! তাই বড়ই ইচ্ছা, কোন সাধুমহাজনের সদুপদেশ লাভ করি ও তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি পুণ্য সাধনায় অতিবাহিত করি। শুনিতে পাইলাম, মক্কা মোয়াজ্জমা হইতে কোন এক দরবেশ ওলীঅল্লাহ ইয়ামনে আগমন করিয়াছেন এবং তিনি না কি এখন এই শহরেই আছেন। আমার বড্ড সাধ হয়, তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে। কিন্তু কথা এই যে, তিনি সত্যিকার ওলী কি না! তাহা যাচাই না করিয়া

কিভাবে তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করি। অতএব, আপনারা যদি আমাকে একটু সাহায্য করেন তবে আমি তাহাকে যাচাই করিয়া দেখিতে পারি।

—সকলে সমস্বরে জবাব দিল বেশ ত ইহাতে দোষের কি আছে। বলুন, জাঁহাপনা! আমাদের কি করিতে হইবে?

বাদশাহ বলিলেন, কিছুই করিতে হইবে না। শুধুমাত্র এই বিষমিশ্রিত পান পাত্রটি আপনারা তাঁহার নিকট পৌছাইয়া দিবেন। বলিবেন, আপনি সাধু মহাজন। বাদশাহ নামদার আপনার খ্যাতি শুনিয়া খুবই প্রীত হইয়াছেন। তাই আতিথেয়তা প্রদর্শন হেতু তিনি আপনাকে এই পানপাত্রটিতে সামান্য শরবত প্রেরণ করিয়াছেন। অনুগ্রহপূর্বক উহা পান করিয়া তাহার জন্য মঙ্গল কামনা করুন। ইহার ফল এই দাঁড়াইবে যে, যদি তিনি সত্যিকার ওলী আল্লাহ হইয়া থাকেন তবে পূর্বেই তিনি সবকথা জানিতে পারিবেন এবং তারপর আর কিছুতেই তিনি উহা পান করিবেন না। আর যদি ভণ্ড দরবেশ হন তবে না জানিয়াই তিনি উহা পান করিবেন এবং সাথে সাথে মৃত্যুবরণ করিবেন। এমতাবস্থায় আমরা একজন ভণ্ড তাপসের হাত হইতে নিস্কৃতি লাভ করিব। সকলেই বাদশাহর একথা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মানিয়া লইল এবং একাজে কয়েকজন লোক নিযুক্ত করিল।

যথা সময়ে নির্বাচিত দলটি পানপাত্র সহ হযরত শাহজালালের আস্তানায় হাযীর হইল। বলিল, সাধু মহাজন! আপনার সুযশ ও সুখ্যাতি আমরা বহু পূর্বেই শুনিতে পাইয়াছিলাম। এবার দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হইলাম। আমাদের বাদশাহ নামদারও আপনার সুনাম শ্রবণ করিয়াছেন। আপনার সম্পর্কে তাঁর ধারণা অতি উচ্চে। আপনার দর্শন লাভে তিনি ইচ্ছুক। কিন্তু রাজকার্যের নানা ঝামেলায় ব্যস্ত থাকায় তিনি আপনার দরবারে হাযীর হইতে না পারিয়া হাদীয়া স্বরূপ আপনাকে এই সামান্য শরবতটুকু প্রেরণ

করিয়াছেন। অনুগ্রহপূর্বক উহা পান করিয়া বিশ্বনিয়ন্তার দরবারে তাহার উন্নতির জন্য দোআ করুন।

হযরত শাহজালাল (রহঃ) দিব্যজ্ঞান যোগে বাদশাহর চাতুরীর কথা পূর্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন। পানপাত্রটি তিনি হাতে লইলেন। বলিলেন, আমি ফকীর। ফকীরের জন্য ইহা শরাবান তহুরা, কিন্তু যে উহা প্রেরণ করিয়াছে তাহার জন্য ইহা হলাহল স্বরূপ। বলিয়াই তিনি 'বিছমিল্লাহ' উচ্চারণ করতঃ সবটুকু পানীয় পান করিলেন। খোদার কি মহিমা ! বিষপান করিয়াও তাঁহার কিছুই হইল না। এমনকি তাঁহার চেহারাও এতটুকু বিকৃত হইল না।

এদিকে বিষবহনকারী দলটি যখন বাদশাহর নিকট গমন করিল তখন দেখিল, বাদশাহ আর ইহজগতে নাই। বলা বাহুল্য, হযরত শাহজালালের বিষপান কবার সাথে সাথেই বাদশাহর মৃত্যু হইয়াছিল। ব্যাপার দেখিয়া সকল লোক তাজ্জব বোধ করিল। হযরত শাহ-জালালের কামালিয়াত সম্বন্ধে তাহাদের আর কোন সন্দেহ রহিল না। তাহাদের অনেকেই এই মহাপুরুষের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিল ও অনেকে তাঁহার সঙ্গী হইল।

বাদশাহর মৃত্যুর পর তাহার পুত্র যুবরাজ শেখ আলীই ছিলেন সিংহাসনের প্রকৃত দাবীদার কিন্তু পিতার মৃত্যুতে তাঁহার মনে এমন বৈরাগ্য আসিয়া গিয়াছিল যে, রাজ্য ও রাজত্ব তাঁহার কাছে বিষবৎ বলিয়া মনে হইল। পিতার জানাযা ও দাফন কাফন শেষ করিয়া তিনি হযরত শাহজালাল সকাশে হাযীর হইলেন। বলিলেন, হযরত ! আমাকে আপনার শিষ্যত্ব দান করিয়া ধন্য করুন ও আপনার পদপ্রান্তে আশ্রয় দিন। পাপ পঙ্কিল জগতের কলুষতা হইতে আমি মুক্তি পাইতে চাই। আমাকে সাহায্য করুন।

হযরত শাহজালাল (রহঃ) তাহাকে স্নেহার্দ্র স্বরে বলিলেন, বাবা ! তুমি রাজার পুত্র রাজা। তোমার কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে রাজ্য পরিচালনা করা। যাও ! প্রজাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিও, তাহাদের প্রতি

যুলুম করিও না। তাহাদের ন্যায্য দাবীগুলি মানিয়া লইয়া ন্যায় বিচার করিও, সকলকাজে আল্লাহর আইনকে প্রাধান্য দিও। আমি দোয়া করি আল্লাহ তোমাকে সৎপথে থাকার তাওফীক দিন, তোমার ইহকাল ও পরকাল মঙ্গলময় হউক।

যুবরাজ শেখ আলী মসনদে আরোহণ করিলেন বটে কিন্তু তাঁহার মন কিছুতেই রাজকার্যে বসাইতে পারিলেন না। পিতার মৃত্যুতে মনে যে বৈরাগ্যভাব সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা আর দূর হইল না। গভীর রাত্রে রাজ্য-রাজত্ব সবকিছু পরিত্যাগ করিয়া তিনি হযরত শাহজালালের পানে ধাবিত হইলেন এবং একাধারে চৌদ্দদিন সফর করার পর তিনি তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন।

হযরত শাহজালাল দেখিলেন, এই যুবক আর কখনও রাজকার্যে মনোনিবেশ করিতে পারিবে না। যে আগুন তাহার অন্তরে প্রজ্বলিত হইয়াছে তাহা নিভিবার নহে। সংসার জীবনের প্রতি তাহার অনাসক্তি আসিয়া গিয়াছে সুতরাং তাহাকে আর সংসারের মায়া জালে আবদ্ধ হইতে দেওয়া উচিত নয়। তাই তিনি তাহাকে দীক্ষাদান করতঃ শিষ্যত্বে বরণ করিয়া লইলেন। যুবরাজ শেখ আলী দীক্ষা-গুরুর অনুগমন করিলেন। রাজ্য, রাজত্ব, সিংহাসন, পদমর্যাদা সব কিছুই পড়িয়া রহিল পশ্চাতে। তিনি সে দিকে ভ্রুক্ষেপও করিলেন না। খোদা-প্রেমের কাছে হার মানিল সংসার জীবনের আসক্তি।

ভক্তের দল

পূর্বেই বলা হইয়াছে, হযরত শাহজালাল (রহঃ) যখন হিন্দুস্তানের পথে যাত্রা করেন তখন তাঁ'র সঙ্গী ছিল মোট বারজন। ইহাদের মধ্যে হাজী ইউসুফ, হাজী দরিয়া ও হাজী খলিল ছিলেন প্রধান। যাত্রার প্রাক্কালে দীক্ষাগুরু হযরত সাইয়েদ আহমদ কবীর যে মৃত্তিকাটুকু দান করিয়াছিলেন তাহা তিনি অন্য এক ভক্ত দরবেশের

নিকট সমর্পণ করেন। পরবর্তী কালে তিনি চাশ্‌নি পীর নামে খ্যাতিলাভ করেন।

হযরত শাহজালাল (রহঃ) যতই সম্মুখে অগ্রসর হন ততই তাঁহার শিষ্যসংখ্যা বাড়িতে থাকে। আল্লাহর ওলীর সাহচর্য লাভের জন্য লোকেরা পঙ্গপালের ন্যায় চারিদিক হইতে তাঁহার নিকট আসিতে আরম্ভ করে। এই সফরে হযরত শাহজালাল বিভিন্ন স্থানে গমন করেন। রোম, বাগদাদ, সমরকন্দ, কিরমানশাহ, আরব, আফগানিস্তান, গযনী, মুলতান, আজমীর, নার্নুল প্রভৃতি জায়গা পরিভ্রমণ করিয়া যখন তিনি দিল্লীর মাটিতে পা রাখেন তখন তাঁহার শিষ্যের সংখ্যা অনেক বেশী। সৈয়দ ওমর, করিমদাদ, নিযামুদ্দীন, শাহগাবরু, জাকারিয়া, শাহ দাউদ, মখদুম জাফর, সৈয়দ মুহাম্মদ, আরিফ জুনায়েদ, মুহাম্মদ শরীফ, সৈয়দ কাসেম হেলিমুদ্দীন ইত্যাদি বোযর্গ কামেল ওলীগণ তাঁহারই শিষ্য ছিলেন।

হযরত শাহজালাল (রহঃ) পথ চলিয়াছেন। শুধু চলা আর চলা। গুরুর আদেশ—তাঁহাকে হিন্দুস্থান পৌঁছিতে হইবে, পৌত্তলিকতার অভিশাপ দূর করিয়া তথায় ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করিতে হইবে।

গাড়ী নাই, ঘোড়া নাই, রেল নাই, জলযান নাই; অবলম্বন শুধু দুইখানা পা। পায়ে হাঁটিয়াই তাঁহাকে সুদূর হিন্দুস্থান পৌঁছিতে হইবে। জীবন যায় যাক, তবুও দ্বীনে ইলাহীর প্রচার কার্যে শৈথিল্য প্রদর্শন করা চলিবে না।

কখনও দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমির খরতপ্ত বালুকারাশি, কখনও সুবিস্তৃত দুর্ভেদ্য বনরাজি, কখনও দুর্গম পর্বতমালা, কখনও বা তুষারাবৃত পিচ্ছিল পথ অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে সামনে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। নিদাঘক্লান্ত দিবার অবসানে কখনও তিনি আশ্রয় নিয়াছেন মসজিদের উন্মুক্ত চত্বরে, কখনও বা বেদুইনদের তাবুতলে। শীতের প্রকোপে ভক্তের দল আগাইয়া দিয়াছেন স্ব স্ব

কম্বল, কিন্তু তাঁহার সেদিকে খেয়াল নাই। তিনি আপন মনে তসবীহ জপেন ও প্রয়োজন মত ভক্তবৃন্দকে সদুপদেশ দান করেন। কি অশেষ ধৈর্য !

নিযামুদ্দীন আউলিয়ার সাথে হযরত শাহজালালের সাক্ষাৎকার

নিযামুদ্দীন আউলিয়া (রহঃ) তখন দিল্লীর বিখ্যাত ওলী। সর্বত্র তাঁহার নাম, ভক্তের সংখ্যাও অনেক। এহেন অবস্থায় হযরত শাহজালাল (রহঃ) যখন দিল্লীতে পৌঁছিলেন তখন এক ভক্ত মুরীদ তাঁহাকে এই সংবাদ পরিবেশন করিল। মুরীদ বলিল, হুযুর সুদূর মক্কা মোয়াজ্জমা হইতে এক দরবেশ দিল্লীতে আগমন করিয়াছেন। তাঁহার শিষ্যরা বলে তিনি নাকি খুব কামেল ওলী। তিনি বিবাহ করেন নাই। স্ত্রীসঙ্গ তিনি পছন্দ করেন না। এমন কি মেয়েদের মুখ দর্শনও তিনি পছন্দ করেন না। এবং এজন্য পথ চলাকালে তিনি মুখ ঢাকিয়া চলেন। তাঁহার খেদমতের জন্য একটি ছোট বালক রহিয়াছে, সে-ই তাঁহার সকল কাজ করিয়া দেয়।

মুরীদের মুখে আগন্তুক দরবেশের কথা শুনিয়া হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়ার সন্দেহ হইল। তিনি সত্যিকার ওলীআল্লাহ না ভণ্ড, এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত হইতে পারিলেন না। তাই তিনি জনৈক মুরীদের মারফত তাঁহাকে নিজ আস্তানায় আমন্ত্রণ জানাইলেন।

দিব্যজ্ঞান সম্পন্ন হযরত শাহজালালের নিকট তাঁহার এ অন্যায় সন্দেহ অবিদিত রহিল না। তিনি হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়ার আমন্ত্রণের কোন জবাব না দিয়া একটি কৌটার মধ্যে কিছু তূলা ও একটি জ্বলন্ত অঙ্গার সম্মিলিত ভাবে পাশাপাশি রাখিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। যথাসময়ে ভক্ত মুরীদ কৌটাটি আনিয়া হযরত নিযামুদ্দীনের হস্তে সমর্পণ করিল। কৌতুহল ভরে হযরত

নিযামুদ্দীন (রহঃ) কৌটাটি খুলিতেই বিস্ময়ে থ খাইয়া গেলেন। কি আশ্চর্য! জ্বলন্ত অঙ্গারের পার্শ্বে তুলা! অথচ তুলার গায়ে আগুনের একটি আঁচড়ও লাগে নাই। তিনি বুঝিলেন, এ তাঁহার অন্যায় সন্দেহের জবাব। হযরত শাহজালাল পৃথিবীর কলুষপূর্ণ পরিবেশে থাকিয়াও কলুষতা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত রহিয়াছেন। পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। নিষ্কলুষ, নির্দোষ, সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের অধিকারী তিনি।

হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া (রহঃ) নিজ অন্যায় সন্দেহের জন্য মনে মনে ভারী অনুতপ্ত হইলেন। কালবিলম্ব না করিয়া তিনি ছুটিয়া চলিলেন হযরত শাহজালালের আস্তানায়। হযরত শাহ-জালাল (রহঃ)ও বোধহয় এই মুহূর্তটিরই অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি দণ্ডায়মান হইয়া হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়াকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। দুই ওলীর সে মহা মিলনে ভক্তবৃন্দের হৃদয় আপ্লুত হইয়া উঠিল। তাঁহারা দণ্ডায়মান হইয়া উভয় ওলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন। মিলন পর্ব শেষ হইয়া গেলে হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া তাঁহার নিকট নিজ অন্যায় সন্দেহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। উভয় ওলী পরস্পর প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া একে অপরের জন্য দোআ করিলেন।

মনির কদর বাদশাহ জানে আর জানে তা' জওহরী
জানে বুলবুল ফুলের কদর আর জানে সে শাহ্‌পরী।

যাহারা গুণী, তাহারা গুণীর কদর না করিয়া পারেন না। বিশেষতঃ হযরত জাহজালাল ও নিযামুদ্দীন আউলিয়া যে একই পথের পথিক ছিলেন। উভয়ই ছিলেন প্রেমপথের পথিক, একই আল্লাহর ওলী তাঁহারা, উভয়েরই অন্তরে প্রজ্জলিত হইয়াছিল ঐশী প্রেমের সমুজ্জল আলোকরশ্মি।

নিযামুদ্দীন আউলিয়া (রহঃ) হযরত শাহজালাল (রহঃ)কে নিজ আস্তানায় আমন্ত্রণ করিলেন। হযরত শাহজালাল (রহঃ) সানন্দে

তাহা কবুল করিলেন। তাঁহার শিষ্যবৃন্দও আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়ার আস্তানায় গমন করিলেন। আস্তানাটি আল্লাহর ওলীদের পদধূলিতে সজীব হইয়া উঠিল। রাতদিন তাঁহারা যেকের আযকার, মোরাকাবা মোশাহাদা ও ধর্মালোচনায় ব্যাপৃত রহিলেন। বলা বাহুল্য, হযরত শাহজালাল (রহঃ) যে কয়দিন দিল্লী নগরীতে ছিলেন সে কয়দিন আর কাহারও দাওয়াত তিনি কবুল করেন নাই। এই আস্তানায় থাকিয়াই তিনি ধর্মালোচনা, সদুপদেশ ও মোরাকাবা মোশাহাদা নিয়া ব্যস্ত ছিলেন।

হযরত শাহজালাল (রহঃ) যখন দিল্লী হইতে বিদায় গ্রহণ করেন তখন হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া (রহঃ) তাঁহাকে এক জোড়া কবুতর উপহার দেন। হযরত শাহজালালের নামানুসারে এই কবুতরগুলি পরবর্তী কালে জালালী কবুতর নামে অভিহিত হয়। হযরত শাহজালালের দরগাহ ছাড়াও সিলেটের বিভিন্ন জায়গায় এখনও এই কবুতর দেখা যায়। কোন হিন্দু বা মুসলমান উহা বধ করে না। লোকের বিশ্বাস, এই কবুতর বধ করিলে যে কোন অমঙ্গল ঘটার সম্ভাবনা আছে। তাহারা আরও বিশ্বাস করে যে, কোনও বাড়ীতে যদি জালালী কবুতর আপনা হইতে আসিয়া বাসা বাঁধিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে মনে করিতে হইবে যে ঐ লোকের সমৃদ্ধির দিন আগত প্রায়। অতি অল্প দিনেই সে অগাধ ধন-সম্পত্তির মালিক হইবে। পক্ষান্তরে যদি কোন বাড়ী হইতে জালালী কবুতর বাসা ছাড়িয়া চলিয়া যায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তাহার সুদিন গত হইয়াছে, দুর্দিন আগত প্রায়। বিপদ-আপদ, বালা-মুসীবত তাহাকে ঘিরিয়া ধরিতে পারে। হিন্দু-মুসলমান কমবেশী সকলেরই এইরূপ ধারণা। এই ধারণা কতটুকু সত্য বা মিথ্যা তাহা আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। পাঠক পাঠিকা-বৃন্দের বিশ্বাসের উপরেই উহা নির্ভর করে। আমরা শুধু এতটুকু কথাই বলিতে চাই যে, যে মহা মনীষীকে কেন্দ্র করিয়া এই সাধারণ

পাখীগুলির এত মর্যাদা, তিনি নিজে কত বড় মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। কবুতর সম্পর্কে সাধারণের উক্ত বিশ্বাস যদি ভ্রান্তও হয় তবুও একথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, কোন সাধারণ লোকের পোষা পাখী সম্পর্কে যুগ যুগ ধরিয়া লোকের মনে এইরূপ বিশ্বাস অটল থাকিতে পারে না। তা'ছাড়া পাখীর কি মূল্য! মহান বোযর্গের পোষা কবুতর বলিয়াই তো তাহার এত মর্যাদা! তাহাই যদি হয় তবে তিনি নিজে যে একজন অসাধারণ বোযর্গ কামেল ওলী ছিলেন তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

গৌড় গোবিন্দের আমলে সিলেটের অবস্থা

দিল্লী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া হযরত শাহজালাল (রহঃ) বিহার গমন করিলেন। এখান হইতেও বেশ কয়েকজন তাঁহার শিষ্যত্ব বরণ করিয়া লইয়া তাঁহার অনুগামী হইল। ইহার পর তিনি বাংলাদেশের সপ্তগ্রামে আসিয়া পৌঁছেন। ঐ সময় সপ্তগ্রাম একজন মুসলমান নৃপতির শাসনাধীনে ছিল। মুসলিম নৃপতি এই বোযর্গদরবেশকে পাইয়া সাদরে বরণ করিয়া লইলেন এবং তথায় স্থায়ীভাবে থাকার জন্য তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, কিন্তু হযরত শাহজালাল (রহঃ) তাহাতে রাজী হইলেন না। গুরুপ্রদত্ত মাটির অনুরূপ বর্ণ, গন্ধ ও স্বাদ বিশিষ্ট মাটি না পাওয়া পর্যন্ত তিনি স্থায়ী ভাবে কোথাও আস্তানা গাড়িতে সম্মত হইলেন না।

হযরত শাহজালালের শ্রীহট্ট (বর্তমান সিলেট জেলার অপর নাম।) আগমনের পূর্বে গৌড়ের রাজা ছিলেন গোবিন্দ। গৌড়ের রাজা বলিয়া তাহাকে গৌড় গোবিন্দ বলা হইত। গোবিন্দের বংশ পরিচয় সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। অজ্ঞাত কুলশীলা বলিয়াই লোকের ধারণা। তবে তা'র সম্পর্কে একটি জনশ্রুতি আছে যে, তিনি সমূদ দেবতার ঔরসজাত পুত্র। বিবরণটা একটু খুলিয়াই বলি—

পূর্বকালে ত্রিপুরা রাজ্যের শাসনকর্তা ছিলেন একজন হিন্দু নৃপতি। তিনি খুব বিলাসী ও আমোদপ্রিয় ছিলেন। শতশত সুন্দরী যুবতী কন্যা রাজ মহিষী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিয়া তাহার গৃহের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল। ইহাদের একজন গোপনে গোপনে সমুদ দেবতার সংগে প্রেম-জালে আবদ্ধ হয়। আজকাল দেবতা বলিতে সাধারণতঃ যেমন কোন অশরীরী শক্তিকে বুঝায়, সমুদ তাহা ছিল না। সে ছিল মানবীয় উপাদানে গড়া কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য বিশিষ্ট একজন সাধারণ মানুষ। তবুও তাহাকে দেবতা বলা হইত কেন? সে প্রশ্নের এই উত্তর দেওয়া যায় যে, হয়ত তাহার মধ্যে বিশেষ কোন গুণ ছিল বলিয়া তৎকালীন সরলপ্রাণ লোকেরা তাহাকে দেবতা জ্ঞানে মান্য করিত।

যাহা হউক—আমরা মূল আলোচনায় ফিরিয়া আসি। উক্ত রাজ মহিষী রাতের অন্ধকারে সমুদের সহিত মিলিত হইয়া থাকে। বোধ হয় বেশ কিছু দিন ধরিয়াই এইরূপ প্রেমলীলা চলিতেছিল, তাই কথা আর চাপা রহিল না। ক্রমে কথাটা রাজার কানে গিয়া পৌছিল। শুনিয়া রাজার হিতাহিত জ্ঞান রহিল না। তিনি সেই মুহূর্তে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া রাজ-মহল হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

যুবতী নির্বাসিতা হইল, কিন্তু যে বীজ তাহার গর্ভে প্রবেশ করিয়াছিল তাহা আর চাপা দেওয়া গেল না। নির্দ্ধারিত সময়েই তাহা আত্মপ্রকাশ করিল। যুবতী তাহার নাম রাখিল গোবিন্দ। ইহাই লোক মুখে প্রচলিত রাজা গোবিন্দের জন্ম পরিচয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

গোবিন্দ ভীম দর্শন, কুৎসিত ও কদাকার ছিল। তাহার বীভৎস চেহারা মানব মনে একদিকে যেমন ঘৃণার ভাব জাগাইয়া তুলিত অন্য দিকে সকলে তাহাকে ভয়ও করিত। সে যেমন সাহসী, তেমনি বলশালী ছিল। সাহস, বল ও উচ্চাশাই তাহাকে পরবর্তীকালে গৌড়ের রাজ সিংহাসন আয়ত্তাধীন করিতে সাহায্য করিয়াছিল।

জনশ্রুতি মোতাবেক একেত কলুষপূর্ণ রক্ত তাহার দেহের প্রতিটি শিরা উপশিরায় বিদ্যমান ছিল, রাজশক্তি হাতে আসার পর তাহা অধিকতর মাথাচাড়া দিয়া উঠিল। কত যে যুবতী কন্যা তাহার অঙ্ক-শায়িনী হইয়া সতীত্ব বিসর্জন দিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। অনাচার, অবিচার, ব্যভিচার ছিল তাহার নিত্যকার স্বভাব। প্রজাবৃন্দ তাহার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হওয়া সত্বেও মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিত না। কারণ, তাহার শাসন ছিল অত্যন্ত কড়া। রোষদীপ্ত শাসনদণ্ড যাহার স্কন্ধে পতিত হইত, তাহাকে হয় পালাইয়া বাঁচিতে হইত, না হয় ইহজগতের সকল মায়া পরিত্যাগ করিয়া চিরতরে পরজগতের পথে পাড়ি জমাইতে হইত। এমতাবস্থায় কাহার সাধ্য যে তাহার বিরোধিতা করে! কিন্তু মানুষের পক্ষে যাহা সাধ্যাতীত, আল্লাহর কাছে তাহা অতি সহজ। গৌড়ের সিংহাসন হইতে এতবড় প্রতাপশালী রাজার অপসারণ ও চিরদিনের জন্য তথায় হিন্দু রাজত্বের অবসানের মধ্য দিয়া আল্লাহ সেই কথাই প্রমাণ করিলেন। ঘটনাটি নিম্নরূপ—

তৎকালীন শ্রীহট্টের টুলটিকর মহল্লার বাস করিতেন বোরহানুদ্দীন নামক জনৈক মুসলমান। রাজা গোবিন্দের আমলে মুসলমানদের ব্যক্তি স্বাধীনতা বলিতে কিছুই ছিল না। মুসলমান সমাজ ছিল গোবিন্দের একান্ত ঘৃণার পাত্র, অস্পৃশ্য, ম্লেচ্ছ। স্বাধীন ভাবে ধর্ম কর্ম পালন করা ত দূরের কথা, তাহারা নিজেদের এলাকা ব্যতীত কোন হিন্দু জনপদে যদৃচ্ছ ভ্রমণও করিতে পারিত না। মানুষ হইয়া মানুষকে ঘৃণা করার যে শিক্ষা তাহা গৌড় গোবিন্দের আমলে তৎকালীন হিন্দু সমাজ বেশ ভাল ভাবেই শিখিয়াছিল। এহেন হিন্দু রাজার একজন সামান্য প্রজা ছিলেন বোরহানুদ্দীন।

বোরহানুদ্দীন খুব ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার বিত্তবৈভবও নেহায়েত কম ছিল না। অন্যান্য দশজনের মত তিনি রাজার আইন মানিয়া লইয়া নির্বিঘ্নে কাল কাটাইতেছিলেন। কিন্তু বিধির ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ।

বোরহানুদ্দীন নিঃসন্তান ছিলেন। অগাধ ধন সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও তাহার মনে শান্তি ছিল না। সন্তানের অভাব যে কিরূপ বেদনাদায়ক, তাহা নিঃসন্তান পিতা-মাতারাই পূর্ণরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন। বোরহানুদ্দীন নিয়মিত নামায পড়িতেন ও একান্ত আকুল হৃদয়ে বিশ্বনিয়ন্তার দরবারে একটি পুত্র সন্তানের জন্য মুনাজাত করিতেন। একদিন তিনি মানত করিলেন যে, যদি মহান আল্লাহ তাঁহার প্রতি সদয় হন ও তাঁহাকে একটি পুত্র সন্তান দান করেন তবে তিনি তাঁহার নামে একটি গরু কোরবানী করিবেন। সরল প্রাণ বোরহানুদ্দীন মানত করিলেন বটে কিন্তু ইহার পরিণাম তিনি একটুও ভাবিয়া দেখিলেন না। রাজা গোবিন্দের আমলে উহা পূর্ণ করা যে কতবড় অপরাধের কাজ এবং তাহার পরিণাম যে কত ভয়াবহ তাহা চিন্তা করিলে হয়ত তিনি এরূপ দুঃসাহসিক কাজের মানত করিতেন না। কিন্তু সন্তানহীন পিতার হৃদয় তখন সন্তান-কামনায় ব্যস্ত, সমগ্র অন্তর জুড়িয়া তাঁ'র সন্তানের বাসনা, এমতাবস্থায় উহার পরিণাম চিন্তা করার তাঁ'র সময় কোথায়? তিনি সন্তানের মুখ-দর্শনাশায় বিভোর হইয়া রহিলেন।

আল্লাহ রহমানুর রহীম, তাঁ'র করুণারও শেষ নাই, দয়ারও সীমা নাই। বোরহানুদ্দীনের সকাতর প্রার্থনা তাঁহার করুণা সাগরে ঢেউ তুলিল। তিনি বোরহানুদ্দীনের প্রতি সদয় হইলেন।

প্রৌঢ়া বোরহান-পত্নী গর্ভবতী হইলেন। জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছিয়া বোরহানুদ্দীন এই সর্বপ্রথম পিতা হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিতে যাইতেছেন দেখিয়া আনন্দে তাঁহার বুকখানা ফুলিয়া উঠিল। তিনি আপন সংকল্পে অটল থাকিয়া খোদার উপর ভরসা করিয়া রহিলেন।

যথাসময় বোরহান-পত্নী একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। সুন্দর ফুটফুটে একটি শিশু যেন আকাশের চাঁদ তাহাদের গৃহে নামিয়া আসিল। বোরহানুদ্দীন আনন্দে আত্মহারা হইলেন। তিনি

সেই মুহূর্তে ফকীর মিসকীন ডাকিয়া খাওয়াইলেন, দান সদকা করিলেন, আনন্দাতিশয্যে পাড়াপ্রতিবেশীকে দাওয়াত করিয়া খাওয়াইলেন।

স্বপ্নসাধ পূর্ণ হইল। এবার তিনি মানত পূর্ণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন এবং সেই মোতাবেক নিজ গোয়ালের সবচাইতে বড় গরুটি কোরবানী করিয়া গরীব দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন ও মহল্লার সকল আত্মীয় ও পাড়াপ্রতিবেশীকে দাওয়াত করিয়া খাওয়াইলেন।

বোরহানুদ্দীনের মানত পূর্ণ হইল, কিন্তু কোরবানী তাহার তখনও শেষ হয় নাই। যে মহান কোরবানীকে কেন্দ্র করিয়া আল্লাহ সমগ্র বাংলাদেশকে হিন্দু শাসনের কবল হইতে মুক্তি দিবেন সে কোরবানী তখনও বাকী। এবার তাহাই ঘটিতে চলিল।

বোরহানুদ্দীন যখন কোরবানীর মাংস গরীব দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করিতেছিলেন সেই সময় একটি শ্যেন পাখী একখণ্ড মাংস ছোঁ মারিয়া লইয়া যায়। সম্ভবতঃ উড়িয়া পলায়ন করিবার সময় মাংস টুকরাটি তাঁহার চঞ্চু হইতে আলগা হইয়া পড়িয়াছিল। ভাগ্যের কি পরিহাস! পড়বি ত পড়; একেবারে গৌড় গোবিন্দের রাজ প্রাসাদের দরজার সামনে! দরজা ঠেলিয়া বাহির হইতে রাজা দেখিলেন একখণ্ড টাটকা গো-মাংস তাহার দরজার সম্মুখে পড়িয়া আছে। একেত মুসলিম বিদ্বেষী রাজা তদুপরি এই গো-মাংস তাহাকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করিয়া তুলিল। কা'র এতবড় বুকের পাটা যে তাহারই রাজ্যে বসবাস করিয়া গো-হত্যা করিল! যে-ই করুক, সে যে মুসলমান তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, গো-হত্যা হিন্দুদের কাছে মহাপাপ। মুসলমানরাই শুধু পুণ্যজ্ঞানে গো-হত্যা করিয়া থাকে। রাজার আদেশে কর্মচারীরা ছুটিল মুসলিম পল্লীতে। খুব বেশী অনুসন্ধান করিতে হইল না। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাহারা বোরহানুদ্দীনকে গ্রেফতার করিয়া রাজদরবারে হাযীর করিল।

মুসলিম বিদ্বেষী রাজা গৌড় গোবিন্দ বোরহানুদ্দীনকে দেখিয়াই ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। রোষদীপ্ত নয়নে তিনি বোরহানুদ্দীনকে গো-হত্যার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সরলপ্রাণ বোরহানুদ্দান কোন কথাই গোপন করিলেন না। তিনি পুত্রের জন্ম-সংবাদ ও তন্নিমিত্ত গো-কোরবানীর সকল ঘটনা অকপটে ব্যক্ত করিলেন। শুনিয়া রাজা গোবিন্দের ক্রোধ আরও বাড়িয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাত আদেশ জারী করিলেন, যে শিশুর জন্য এই গো-হত্যা করা হইয়াছে, গো-হত্যার প্রতিবিধানে তাহাকেই দেবতার সম্মুখে বলিদান করা হইবে এবং যাহার হাত দ্বারা উহা করা হইয়াছে তাহার হাতও কাটিয়া ফেলা হইবে। ইহা রাজা গোবিন্দের চরম সিদ্ধান্ত। এ সিদ্ধান্তের কোন রদবদল নাই।

রাজ-দণ্ডাদেশ শুনিয়া বোরহানুদ্দীন হায় হায় করিয়া উঠিলেন। রাজার নিকট তিনি নিজ জীবনের বিনিময়ে পুত্রের জীবন ভিক্ষা চাহিলেন কিন্তু পাষাণের কাছে এ আবেদনের কি মূল্য! রাজকর্মচারীরা পুত্রটিকে তাহার মায়ের কোল হইতে ছিনাইয়া আনিয়া পিতার সমক্ষে দেবতার উদ্দেশ্যে বলিদান করিল। তারপর বোরহাদ্দীনের ডাইন হাতখানা কাটিয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সহকারে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

সমগ্র মুসলিম এলাকায় কথাটা প্রচারিত হইয়াছিল এবং ভিতরে ভিতরে তাহাদের যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয় নাই তাহাও নহে। কিন্তু বর্তমান কালের মত সে যুগের লোকদের এত গণতান্ত্রিক মনোভাব ছিল না বলিয়া কেহই রাজার বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে সাহস করিল না।

আহত, পুত্র শোকাহত বোরহানুদ্দীন ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। গতকাল যে ঘরে আনন্দের হিল্লোল বহিয়া যাইতেছিল আজ সেখানে কান্নার রোল। সে কান্নায় বুঝি বা আসমানের ফেরেশতারা পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়াছিল, গাছের পাতা ঝরিয়া পড়িয়াছিল, বাতাস স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল, বনের পাখীরা আকুল হইয়াছিল।

প্রতিবেশীরা সমবেদনা জ্ঞাপন করিতে আসিয়াছিল। কিন্তু কি আসে যায় তাহাতে। পুত্রশোক কি সমবেদনায় নিবারিত হয়? তা'ছাড়া এই সে দিনও যাহারা তাঁহার পুত্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে কত না আনন্দ করিয়া ভুঁড়িভোজন করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, বিপদ মুহূর্তে তাহাদের কেহই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে তাহার সপক্ষে রাজার কাছে একটি কথাও বলে নাই। ইহা কি কম দুঃখের কথা! বোরহানুদ্দীন আপন জ্বালা বুকেই চাপিয়া রাখিলেন। খোদার উপর নির্ভর করিয়া কাল প্রবাহের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

প্রতিশোধের আগুন

কাল প্রবাহে পুত্রপ্রাণা বোরহানুদ্দীনের পুত্রশোক কিছুটা প্রশমিত হইল এবং ক্ষতজ্বালাও তিনি ভুলিয়া গেলেন। কিন্তু মুসলিম-ধর্মের প্রতি হিন্দু রাজার এই অপমানের জ্বালা তিনি কিছুতেই ভুলিতে পারিলেন না। প্রতিশোধের আগুন তাঁহার সমগ্র অন্তরে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

বোরহানুদ্দীন কাহারও সাথে বিশেষ কোন কথা বলেন না। আপন মনে চিন্তা করেন ও প্রতিশোধের উপায় খুঁজিতে থাকেন।

ঐ সময় বাংলাদেশের রাজধানী ছিল সুবর্ণগ্রামে। সামসুদ্দীন আবুল মুজাফ্‌ফর খাজা ইলিয়াছ শাহ ছিলেন তখন বাংলার শাসন-কর্তা। ব্যক্তিত্ব,গুণ-গরিমা ও অশেষ শৌর্য-বীর্যের অধিকারী ছিলেন তিনি। সামরিক শক্তিবলে তিনি রাজ্যসীমা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন। পশ্চিমপ্রান্তে বারানসী এলাকাটিও তাঁহার রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল।

বোরহানুদ্দীন ভাবিলেন, গৌড় গোবিন্দকে সমুচিত শাস্তি দিতে হইলে কোন মুসলমান রাজার শরণাপন্ন হইতে হইবে। শক্তির দমন শক্তি দিয়াই করিতে হইবে। বিনা অস্ত্রে বা ক্ষুদ্র শক্তি দ্বারা তাহাকে কিছুতেই দমন করা যাইবে না।

ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি এক গভীর রাত্রে সুবর্ণ গ্রামাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এক আল্লাহ ব্যতীত তাঁহার এ সংকল্পের কথা কেহই জানিতে পারিল না। জানা নিরাপদও ছিল না। কারণ, তৎকালীন নাগরিকগণ রাজদণ্ডকে যেমনি ভয় করিত, রাজ-অনুগ্রহ লাভের জন্যও তেমনি চেষ্টা করিত। হিন্দু-মুসলমান সকলের মধ্যেই এই প্রবণতা খুব বেশী ছিল। অধুনাযুগে এই প্রবণতা বহুলাংশে হ্রাস পাইলেও এখনও কিছু কিছু লোক দেখা যায়, যাহারা রাজ ভক্তির চরম পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া স্বার্থসিদ্ধির পথ খুঁজিয়া বাহির করে। রাজভক্তি দোষের একথা আমরা বলি না। কিন্তু যেখানে সরকার নিজ খেয়াল খুশী মোতাবেক অন্যায় নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে, সেখানেও জো-হুযুর বলিয়া তাহার গুণগান করিতে হইবে এমন নীতি কেহই স্বীকার করিতে পারে না।

বোরহানুদ্দীন ছিন্ন হস্ত লইয়া শামসুদ্দীনের দরবারে পৌঁছিলেন ও গৌড়ে মুসলমানদের দুর্দশা ও ধর্মীয় স্বাধীনতার চরম অবমাননা ব্যক্ত করিয়া নিজ সকল ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। শুনিয়া শামসুদ্দিনের ক্রোধের অন্ত রহিল না। তিনি পাঠান মুসলমান। পাঠানের রক্ত ধারা তাহার মধ্যে পরিপূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। তিনি সেই মুহূর্তে তদীয়পুত্র সিকান্দর শাহকে গৌড় গোবিন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার নির্দেশ দান করিলেন।

যুদ্ধের আদেশে পাঠান বীরের সমগ্র অন্তর উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। প্রস্তুতি গ্রহণে অধিক সময় নষ্ট করিলেন না। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি তিনি সকল আয়োজন শেষ করিয়া বিরাট সৈন্যদল সহ শ্রীহট্টাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সিকান্দর শাহ সৈন্যদলসহ সোনার গাঁও গমন করিলেন। অতঃপর তথা হইতে পার্বত্য পথে গন্তব্য স্থলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এদিকে সুচতুর রাজা গোবিন্দের কথাটি জানিতে বাকী ছিল না। গুপ্তচর মুখে মুসলিম সৈন্যদের আগমন বার্তা তিনি পূর্বেই

জানিতে পারিয়াছিলেন। কাজেই সেই মোতাবেক তিনি যুদ্ধের আয়োজন করিলেন। ধূর্ত রাজা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার সৈন্য সংখ্যা যত বেশীই থাকুক, মুসলিম সৈন্যের সহিত সম্মুখ-সমরে টিকিয়া থাকা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না। তাই তিনি সৈন্যদিগকে গরিলা যুদ্ধের আদেশ দিলেন।

মুসলিম সৈন্যদল অগ্রসর হইতেছিল। অকস্মাৎ তাহারা আক্রান্ত হইলেন। ঝাঁকে ঝাঁকে অগ্নিবান তাহাদের উপর নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। সিকান্দর শাহ কোন কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। মাত্র এতটুকু বুঝিলেন যে তাহারা শত্রুদল কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন। কিন্তু কোথায় তাহাদের অবস্থান এবং কি ভাবেই বা তাহারা যুদ্ধ পরিচালনা করিতেছে ইহা জানার অবকাশ তাহার মিলিল না। মুসলিম সৈন্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পলায়ন করিতে লাগিল অনেকে ঘটনাস্থলেই শাহাদাত বরণ করিল। সিকান্দর শাহ তাহাদিগকে আর সংঘবদ্ধ করিতে পারিলেন না। ফলে বাধ্য হইয়া অবশিষ্ট সৈন্য সহ তিনি রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন।

গৌড় গোবিন্দের সহিত সন্ধি

ধূর্ত রাজা গৌড় গোবিন্দ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, পাঠান মুসলিম সৈন্যের সাথে যুদ্ধ করিয়া কোন ফল হইবে না। তা'ছাড়া তাহাদের দৃষ্টি যখন একবার এদিকে পড়িয়াছে তখন এত সহজেই যে তাহারা তাহাকে নিষ্কৃতি দিবে তাহা মনে করাও বাতুলতা মাত্র। হয়ত বা নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আবার তাহারা গৌড় আক্রমণ করিয়া বসিবে। কাজেই সময় থাকিতে ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। কিন্তু কি ব্যবস্থাই বা করা যায়! যুদ্ধ, সে ত জয়-পরাজয়ের খেলা। এ খেলায় মুসলিম সৈন্যদের সাথে কিছুতেই পারিয়া উঠা যাইবে না। মুসলমানদের সাথে শান্তিতে বসবাস

করিতে হইলে একটি মাত্র পথই খোলা আছে, তাহা হইল সন্ধি। সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করিতে পারিলেই তাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইতে পারে। রাজা গোবিন্দ সুযোগের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

সিকান্দরশাহ রাজধানীতে ফিরিয়া আসার কয়েকদিন পরেই সুলতান সামসুদ্দীন মৃত্যুবরণ করিলেন। তিনি পূর্বেই অসুস্থ ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে দিল্লীর তৎকালীন সম্রাট আলাউদ্দীনের বেশ সুযোগ মিলিল। তিনি ইতিপূর্বে সুলতান সামসুদ্দীনের সাথে যুদ্ধ করিয়া পরাজয় বরণ করেন এবং শেষ পর্যন্ত আত্মরক্ষার তাকীদে তাঁহার সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। সামসুদ্দীনের মৃত্যুকে তাই তিনি নিজের জন্য আশীর্বাদ মনে করিলেন এবং কালক্ষেপ না করিয়া তিনি বাংলাদেশ আক্রমণের জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন।

এদিকে পিতার মৃত্যুর পর সিকান্দর শাহ বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল গৌড়ের প্রতি। সেখানকার মুসলমানদের প্রতি গোবিন্দের অত্যাচার ও তদুপরি গোপন-যুদ্ধে তাহার সৈন্যক্ষয় তাঁহার ধমনীতে আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছিল। তাই সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি সামরিক শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু বিধি হইল বাম। তিনি সংকল্প পরিবর্তনে বাধ্য হইলেন।

আলাউদ্দীন শাহ কর্তৃক বাংলাদেশ আক্রান্ত হওয়ার ফলে সিকান্দরশাহ ভাবিলেন যদি ধূর্ত রাজা গোবিন্দ এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া দিল্লীর সহিত যোগ দেয় এবং উভয় শক্তি যৌথ ভাবে বাংলাদেশ আক্রমণ করে তবে তাহার পক্ষে সিংহাসন রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। তাই তিনি সাগ্রহে অগ্রনী হইয়া গৌড় গোবিন্দের নিকট সন্ধির প্রস্তাব দিলেন।

গৌড় গোবিন্দ ইহারই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। প্রস্তব আসার সাথে সাথেই তিনি উহা গ্রহণ করিলেন। অতঃপর এক নির্দ্ধারিত

সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে উভয় রাজা পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করিলেন। সন্ধির শর্তানুযায়ী রাজা গোবিন্দ গৌড়ের মুসলমানদের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা দিতে স্বীকৃত হইলেন। তাহাদের প্রতি অন্যায় ভাবে কোনরূপ নির্যাতন করা হইবে না বলিয়াও সন্ধি-পত্রে উল্লেখ রহিল। তা'ছাড়া রাজা গোবিন্দ নিজ খরচে মুসলমানদের তত্ত্বাবধানে শ্রীহট্টে একটি মসজিদ তৈয়ার করিয়া দিতেও স্বীকৃত হইলেন। চৌকা দীঘি নামক স্থানে আদিনা মসজিদ নামে যে মসজিদটি রহিয়াছে উহা রাজা গোবিন্দের খরচে সিকান্দর-শাহের তত্ত্বাবধানেই নির্মিত হইয়াছিল।

উভয় রাজা এই ভাবে পারস্পরিক সন্ধি-চুক্তিতে আবদ্ধ হইলেন বটে কিন্তু তবুও বোরহানুদ্দীন আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না। না পারার কারণ, এই চুক্তিতে মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা স্বীকৃতি হইলেও মত ও আদর্শের দিক দিয়া যেখানে হিন্দুদের সহিত মুসলমানদের সংঘর্ষ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল সেখানে সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমানদিগকে সংখ্যালঘু হিন্দুদের কবল হইতে নিষ্কৃতি দেওয়ার কোন সরকারী ব্যবস্থার কথা সন্ধি-পত্রে উল্লেখ ছিল না। দ্বিতীয়তঃ মুসলিম অধ্যুষিত এলাকার বাহিরে স্বাধীন ভাবে ধর্মানুষ্ঠান পালন বা ধর্ম প্রচারের কোন কথাও উহাতে উল্লেখ ছিল না। তা'ছাড়া এই সন্ধি-পত্রটি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল উভয় পক্ষের রাজ-নৈতিক স্বার্থে। রাজা গোবিন্দ সন্ধি করিয়াছিলেন মুসলমানদের সহিত সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য, আর সিকান্দরশাহ করিয়াছিলেন হিন্দু শক্তিকে দিল্লীর শক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিয়া নিজ সিংহাসন বলবৎ রাখিবার জন্য। সুতরাং এই সন্ধি মুসলমানদের তেমন কোন উপকারে আসিতে পারে না বলিয়াই বোরহানুদ্দীনের ধারণা হইয়াছিল এবং এইজন্যই তিনি উহার প্রতি আস্থা-স্থাপন করিতে পারেন নাই।—এই সন্ধি-পত্রের প্রতি বোরহানুদ্দীনের অনাস্থার আরও একটি কারণ এই ছিল যে, ইহার ফলে তা'র নিজ উদ্দেশ্য

ব্যর্থ হইতে চলিয়াছিল, তিনি চাহিয়াছিলেন. পাঠান শক্তিকে কাজে লাগাইয়া বাংলাদেশ হইতে হিন্দু শাসনের মূলোচ্ছেদ করিতে ও তথায় ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করিতে। কিন্তু এই সন্ধিচুক্তি সে সম্ভাবনার দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিল। তাই বোরহানুদ্দীন উহার প্রতি আদৌ সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই।

সেনাপতি নাসিরউদ্দীন ও হযরত শাহজালাল (রহঃ)

সন্ধির ফলে বোরহানুদ্দীন অনেকটা হতোদ্যম হইয়া পড়িলেন। তাঁহার প্রচেষ্টা এই ভাবে অংকুরে বিনষ্ট হইয়া যাইবে ইহা তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই। প্রথমবারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় এবার তিনি নূতন কর্ম-পদ্ধতি অবলম্বন করিলেন। তাঁহার একমাত্র সংকল্প—যত কষ্টই হউক বাংলাদেশকে হিন্দু শাসনের নাগপাশ হইতে মুক্ত করিতে হইবে।

ও সময়ে দিল্লীর শাসনকর্তা ছিলেন ফিরোজ শাহ তুঘলক। তিনি অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ও প্রজাহিতৈষী সম্রাট ছিলেন। ধর্মে তাঁহার বিশ্বাস ছিল অটল, ভক্তি ছিল প্রগাঢ়। জন সাধারণের হিতার্থে তিনি রাস্তা, পুল, সরাইখানা. মাদরাসা, মসজিদ, মক্তব ইত্যাদি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার শাসনামলে প্রজাবৃন্দ খুব সুখে ও শান্তিতে ছিল। পাঠান নরপতিদের মধ্যে তাঁহার মত উদার ও প্রজাবৎসল সম্রাট খুব কমই ছিল।

বোরহানুদ্দীন ভাবিলেন, বাংলাদেশে মুসলমানদের দুরবস্থার কথা জানাইয়া যদি ফিরোজ শাহ তুঘলককে রাজী করা যায় এবং গৌড় গোবিন্দের প্রতি তাঁহাকে ক্ষেপাইয়া তোলা যায় তবে বাংলাদেশ হইতে হিন্দুশাসনের মূলোচ্ছেদ ঘটা অসম্ভব নয়।

ভাবিয়া চিন্তিয়া বোরহানুদ্দীন দিল্লীর পথে পা বাড়াইলেন ও অনেক কষ্টে দিল্লীতে পৌঁছিয়া সম্রাটের সংগে সাক্ষাৎ করিলেন।

সম্রাট তাঁহার আগমনোদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলে বোরহানুদ্দীন স্বীয় কর্তিত হস্ত দেখাইয়া হৃদয়গ্রাহী ভাষায় নিজ কাহিনী ব্যক্ত করিয়া বাংলাদেশে মুসলমানদের দুরবস্থার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। শুনিয়া সম্রাট ভাবিতে লাগিলেন কি ভাবে এই দুরাচার হিন্দু রাজকে যথোপযুক্ত শাস্তি দেওয়া যায়।

ইতিমধ্যে অনুরূপ ধরনের আরেকটি অভিযোগ সম্রাটের কানে আসিয়া পৌঁছিল—

তরফের শাসনকর্তা ছিলেন আচক নারায়ণ। গৌড় গোবিন্দের মত আচক নারায়ণও ছিলেন ঘোর মুসলিমবিদ্বেষী। নানারূপ অপকর্মে জর্জরিত এই শাসনকর্তাটি মুসলমানদিগকে কোন দিন প্রীতির নজরে দেখিতে পারেন নাই। এহেন ব্যক্তির কর্তৃত্বাধীনে বাস করিয়া নূরুদ্দিন নামক জনৈক মুসলমান পুত্রের বিবাহোপলক্ষে গরু যবেহ করিয়া নিমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দকে ভোজে আপ্যায়িত করেন। আচক নারায়ণের কানে যখন এই সংবাদ পৌঁছে তখন রাগে তিনি বাহজ্ঞান হারাইয়া ফেলিলেন। সেই মুহূর্তে তিনি নূরুদ্দীনকে গ্রেফতার করাইয়া আনিয়া বিনা বিচারে তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। নূরুদ্দীনের ভ্রাতা গোপনে তরফ হইতে পালাইয়া আসিয়া দিল্লীর সম্রাটের নিকট সবিস্তারে সকল ঘটনা ব্যক্ত করিলেন ও ইহার প্রতিকারের দাবী জানাইলেন।

ধার্মিক সম্রাট মুসলমানদের এই অপমান সহ্য করিতে পারিলেন না। পর পর এই দুইটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তথাকার মুসলমানদের করুণ দুরবস্থা অনেকটা আন্দাজ করিয়া লইয়া তদীয় ভাগিনেয় সিকান্দর গাযীকে গৌড় অভিযানের নির্দেশ দান করিলেন। নির্দেশ পাইয়া সিকান্দর গাযী যুদ্ধ যাত্রার আয়োজনে লাগিয়া গেলেন। খুব বেশী দেরী হইল না। যুদ্ধোন্মাদ মুসলিম সৈন্যদল অত্যল্প কালের মধ্যে প্রস্তুত হইয়া আল্লাহর নাম লইয়া যাত্রা করিলেন। পথ প্রদর্শক রূপে রহিলেন বোরহানুদ্দীন।

সময়টা ছিল বর্ষাকাল। যে দেশের লোক সর্বদা মরু প্রান্তরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাটাইয়াছে তাহারা বাংলাদেশের বর্ষাঋতু দেখিলে আশ্চর্য হইবে কি! এ দেশের গ্রীষ্ম আসে আগুন তাতা গরম লইয়া, বর্ষা আসে অগ্নিনির্বাপক শীতল বারিধারা বহণ করিয়া। শিশির ভেজা শেফালী ফুলের বাহার আসে শরতের পিঠে চড়িয়া, হেমন্ত ঘোষণা করে বর্ষার নির্গমন ও শীতের আগমন বার্তা। গরম পরিচ্ছদ তালাস করে শীতের বুড়ী, বসন্ত নিয়া আসে কোকিলের সুমধুর তান। বাংলাদেশের এই ষড় ঋতুর সহিত যাহারা পরিচিত নহে তাহারা বাংলার সঠিক প্রকৃতি নির্ণয় করিতে অক্ষম!

ফিরোয শাহের সৈন্যদল ছিল তুর্কী। এ দেশের আবহাওয়ার সহিত তাহাদের কোন পরিচয় ছিল না। কাজেই অত্যল্পকাল মধ্যেই সিকান্দর গাযী সৈন্যদের নিয়া মহা বিপদে পড়িলেন। বর্ষার কারণে তুর্কী সৈন্যদের অনেকের সর্দিকাশি দেখা দিল, অনেকে জরাক্রান্ত হইয়া পড়িল। চিকিৎসার অব্যবস্থায় কতক সৈন্য মারা পড়িল। যাহারা রোগমুক্ত হইল তাহারাও শক্তিহীন হওয়ায় যুদ্ধক্ষম রহিল না। ফলে সিকান্দর গাযী ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে তাবু স্থাপন করিয়া সম্রাটকে সকল অবস্থা জানাইলেন ও অবিলম্বে নূতন সৈন্য প্রেরণের জন্য আবেদন করিলেন।

দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ সময়কার মুসলমানগণ অনেকটা কুসংস্কারগ্রস্ত ছিল। তাহারা জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশ্বাস করিত এবং কোথাও যাত্রা করিতে হইলে বা সৈন্য প্রেরণ করিতে হইলে পূর্বেই জ্যোতিষীদের মতামত জানিয়া লইত। সম্রাট ফিরোয শাহ তুঘলকও এই কু-সংস্কার হইতে মুক্ত ছিলেন না। সিকান্দর গাযীর পত্র পাইয়া তাই তিনি সভাসদবৃন্দ ও জ্যোতির্বিদগণকে ডাকিলেন। যথা সময়ে তাহারা উপস্থিত হইলে সম্রাট তাহাদিগকে সিকান্দর গাযীর পত্রের মর্ম অবগত করাইয়া নূতন সৈন্য প্রেরণ করা সম্বন্ধে তাহাদের মতামত জানিতে চাহিলেন। সভাসদগণ সকলেই সায় দিলেন, কিন্তু

জ্যোতির্বিদগণ ভিন্ন মত পোষণ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, জাঁহাপনা! সিকান্দর গাযী একজন উপযুক্ত সেনাপতি তাহাতে সন্দেহ নাই। যুদ্ধ বিদ্যায় ও সমর কৌশলে তাঁ'র খ্যাতি সর্বজন বিদিত। তবুও জ্যোতির্বিদ হিসাবে আমরা যা' দেখিতে পাইতেছি তাহাতে মনে হয় এ যাত্রা সিকান্দর গাযীর পক্ষে অনুকূল নহে। তাঁহার পরিবর্তে অন্যকোন লোককে সিপাহসালার করিয়া প্রেরণ করুন। তিনিই ঐ কাজে সাফল্য অর্জন করিবেন।

শুনিয়া সম্রাট মহা ভাবনায় পড়িয়া গেলেন। সেনা বিভাগে সিকান্দর গাযীর মত এত রণনিপুণ সমর কৌশলী আর কে আছে? কাহাকে সেনাপতির ভার দেওয়া যায়? জ্যোতির্বিদগণ বলিলেন, জাহাপনা! চিন্তার কোন কারণ নাই। বিশ্বনিয়ন্তা যাহার হাত দিয়া আপনাকে জয়ের মাল্য দান করিবেন তিনি আপনার সেনা বিভাগেই রহিয়াছেন। তিনি কে তাহা আমরা বলিতে পারি না, তবে তাহার একটি বিশেষ চিহ্ন এই যে, অতি প্রচণ্ড বায়ু চলাকালেও তাঁহার ঘরের প্রদীপ নির্বাপিত হয় না। খুব বেশী অপেক্ষা করিতে হইবে না। রাশিচক্র অনুযায়ী আগামীকালই প্রচণ্ড ঝড় হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আপনি সেনা বিভাগে আদেশ জারী করিবেন ঝড় প্রবাহকালে সকলেই যেন নিজ নিজ গৃহে প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখে। ঝড়ের তাণ্ডবে প্রদীপ আপনা হইতে নির্বাপিত না হইলে কেহ যেন স্বেচ্ছায় প্রদীপ নির্বাপিত না করে। সম্রাট উৎফুল্ল হইলেন। এত বড় সমস্যার সমাধান এইরূপ সহজ অথচ আশ্চর্যজনক ভাবে সম্পাদিত হইবে ভাবিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি সেই মুহূর্তে সৈন্যদের মধ্যে জ্যোতির্বিদগণের বর্ণনা মোতাবেক আদেশ জারী করিলেন।

পরদিন সত্যই ঝড় দেখা দিল। ঝড়ের প্রচণ্ড তাণ্ডব নৃত্যে সবকিছু ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইবার উপক্রম হইল। সমগ্র দিল্লী নগরী অন্ধকারের ঘন তমসায় তমসাচ্ছন্ন। কাহারও গৃহে প্রদীপ নাই।

রাস্তায় গ্যাসের বাতিগুলি নিভিয়া গিয়াছে। এহেন অবস্থার মধ্য দিয়াও দেখা গেল একটি গৃহে মিটিমিটি করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছে। প্রবলবাত্যা তাহার ঘরের আলো নির্বাপিত করিতে পারে নাই। তিনি পরম ধার্মিক সৈয়দ নাসিরউদ্দীন।

সৈয়দ নাসিরউদ্দীন বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন। সম্ভবতঃ কোন রাজনৈতিক কারণে তিনি বাগদাদ পরিত্যাগ করিয়া ভারতে আশ্রয় নিয়াছিলেন এবং জীবিকার্জন হেতু আত্মপরিচয় গোপন করিয়া দিল্লীর সম্রাটের অধীনে সেনাবিভাগে চাকরি নিয়াছিলেন।

নাসিরউদ্দীন খুব অমায়িক লোক ছিলেন। তাঁহার সরল মধুর ব্যবহার সেনা বিভাগে তাঁহাকে অশেষ মর্যাদার অধিকারী করিয়াছিল। তিনি মিতভাষী ছিলেন। কথা বলিতেন অল্প, অথচ যাহা বলিতেন তাহা হইত তথ্যপূর্ণ। বাচনভঙ্গী হইতে যেন মধু ঝরিয়া পড়িত। —নাসিরউদ্দীন নিয়মিত নামায পড়িতেন, রোযা রাখিতেন ও কোরআন মজীদ তেলাওয়াত করিতেন। জীবনে তিনি কখনও নামায ক্বাযা করেন নাই। এমন কি প্রচণ্ড যুদ্ধের ময়দানে যখন সৈন্যগণ জীবন মরণ সংগ্রামে লিপ্ত, এতটুকু অবকাশ যখন তাহাদের মিলিত না তখনও নাসিরউদ্দীনের নামায ক্বাযা হইত না। ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথেই তিনি নামায আদায় করিয়া লইতেন। তাঁহার শিষ্টাচার দেখিলে মনে হইত যেন এইরূপ নিরীহ মানুষ জগতের বুকে দ্বিতীয়টি নাই, কিন্তু কি আশ্চর্য! এই মানুষটিই আবার যখন যুদ্ধের ময়দানে গমন করিতেন তখন তাঁহার শৌর্য, বীর্য, রণচাতুর্য ও অপূর্ব সাহসিকতা দেখিলে কে বলিতে পারিত যে, এই সেই কোমল প্রাণ-নাসিরউদ্দীন। একদিকে তিনি ছিলেন ফুলের মত কোমল, অন্যদিকে তিনি ছিলেন বজ্রের মত কঠোর। তাহার শান্ত স্বভাব ও শিষ্টাচার যেমন উদাহরণ যোগ্য ছিল, সাহসিকতাও তেমনি অপূর্ব ছিল। বলাবাহুল্য, এই দুইটি গুণই তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পিতৃপুরুষদের রক্তধারা হইতে লাভ করিয়াছিলেন। সাধনা জগতে তাঁহার স্থান ছিল অতি উচ্চে।

তিনি নীরব সাধনা করিতেন, কিন্তু কেহই তাহা জানিতে পারিত না। নীরব নিশীথে বহির্জগতের সমস্ত কোলাহল যখন থামিয়া যাইত তখন তিনি গাত্রোত্থান করিতেন ও নির্জন সাধনায় লিপ্ত হইতেন।

সম্রাট ফিরোয শাহ নাসিরউদ্দীনকে তলব করিলেন। বলিলেন, আপনার পরিচয় আমি পাইয়াছি। বাংলাদেশে মুসলমানদের উপর নির্যাতন চলিতেছে। তাহাদের প্রতি অত্যাচারের কাহিনী আমার কান ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাই মুসলমানদিগকে নিষ্কৃতি দানের উদ্দেশ্যে আমি বাংলাদেশ দখলের নির্দেশ দান করিয়া সিকান্দর গাযীর সেনাপতিত্বে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছি। তাহারা এখন ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে প্রতিকুল অবস্থার মধ্যে কাল কাটাইতেছে। সিকান্দর গাযী রণনিপুণ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার মনে হয় এইস্থলে তাঁহার রণচাতুর্য কাজে আসিবে না। তাই আমি স্থির করিয়াছি— এ কাজের দায়িত্ব আপনাকেই প্রদান করিব। আমার বিশ্বাস— আপনিই ইহার যোগ্যতম ব্যক্তি। আপনার হাত দ্বারাই আল্লাহ বাংলাদেশের মুসলমানদের নিষ্কৃতি দান করিবেন। এই আমার নির্দেশনামা। যান, আপনার অধিনায়কত্বে এখন যে সব সৈন্য আছে তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করুন এবং যথাস্থানে গমন করিয়া পূর্ণ বাহিনীর সেনাপতির ভার গ্রহণ করুন।

হায় আল্লাহ! তোমার মহিমার অন্ত নাই। তুমি বাদশাহকে ফকীর বানাও, ফকীরকে বসাও রাজসিংহাসনে। গতকাল যে নাসিরউদ্দীন সামান্য একজন সৈনিক, আজ সে সম্পূর্ণ বাহিনীর সেনাপতি। কৃতজ্ঞতাভারে সৈয়দ নাসিরউদ্দীনের মস্তক আপনা হইতে নত হইয়া আসিল। তিনি মনে মনে আল্লাহর শোকর করিলেন। পদগৌরব কোন গৌরব নয়, পদমর্যাদার কোন মূল্য নাই, যদি না তা'র সাথে খোদা-প্রেমের সংমিশ্রণ থাকে। নাসিরউদ্দীন ইহাকে খোদা প্রদত্ত দান বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং ভক্তি-অবনত চিত্তে উহা গ্রহণ করিয়া খোদার দরবারে কৃতজ্ঞতার হাত বিস্তার করিলেন।

দিল্লী হইতে যাত্রা করিয়া হযরত শাহজালাল (রহঃ) এলাহাবাদ পৌছিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে তখন তিনশত এগারজন দরবেশ। ধর্ম প্রচার ও সদুপদেশ দানের মাধ্যমে বিভ্রান্ত মানুষকে ইসলামের সুমহান আদর্শে অনুপ্রাণিত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তি ও অলৌকিকত্বের কথা তখন সর্বত্র প্রচারিত হইয়া গিয়াছে। ফুলের সুবাস যেমন ঢাকিয়া রাখা যায় না, উহা আপনা হইতেই বায়ু-ভরে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে, হযরত শাহজালালের খ্যাতিও তেমনি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। যে কাছে আসে সেই তাঁহার সদুপদেশ লাভ করে। সিপাহসালার সৈয়দ নাসিরউদ্দীন তাঁহার সাথে সাক্ষাৎ করিলেন ও সকল কথা তাঁহাকে সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া শুনাইলেন। হযরত শাহজালাল (রহঃ) বলিলেন, ভয় নাই, আল্লাহই সবকিছুর মালিক। যাহাকে ইচ্ছা তিনি গৌরব দান করেন, যাহাকে ইচ্ছা অপদস্থ করেন। চলুন, আমরাও আপনাদের সঙ্গী হইতেছি। আল্লাহর ইচ্ছা হইলে কোন শক্তিই আমাদের সদুদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করিতে পারিবে না।

যথাসময়ে নাসিরউদ্দীন সৈন্যদলসহ সিকান্দর গাযীর সহিত মিলিত হইলেন। সংগে হযরত শাহজালাল (রহঃ)ও তাঁর তিনশত এগারো জন অনুচর। সিকান্দর গাযী এবার স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। এতদিন শুধু সামরিক শক্তিই ছিল, এবার তা'র সাথে আধ্যাত্মিক শক্তি যুক্ত হওয়ায় গোটা বাহিনী নব বলে বলীয়ান হইয়া উঠিল। তাহারা শ্রীহট্ট অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শ্রীহট্ট অভিযানে হযরত শাহজালাল ও মুসলিম বাহিনী

সুচতুর গৌড় গোবিন্দ পূর্বেই এই অভিযানের কথা জানিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু বাধা দেওয়ার মত শক্তি তাহার ছিল না। হযরত শাহজালাল ও তদীয় অনুচর দরবেশদের আধ্যাত্মিক শক্তি-

বলে বলীয়ান এই বাহিনী বিনা বাঁধায় ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম করিয়া কুমিল্লায় আগমন করিল। যদিও সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতি ছিলেন সৈয়দ নাসির উদ্দীন এবং তাঁ'র আদেশেই সৈন্য বিভাগ পরিচালিত হইত, তথাপি হযরত শাহজালালের নির্দেশ ব্যতীত কোন কাজই হইত না। হযরত শাহজালালই ছিলেন তাহাদের পথের দিশারী। কুমিল্লায় হযরত শাহজালাল সৈন্যদের হইতে দূরে এক নির্জন জায়গায় আস্তানা গাড়িয়া কয়েকদিন সেথানে অবস্থান করিয়াছিলেন। অদ্যাবধি সেথানে শাহজালালের দরগাহ নামে একটি দরগাহ রহিয়াছে।

অতঃপর হযরত শাহজালাল ও মুসলিম বাহিনী গৌড় রাজ্যের দক্ষিণ সীমায় নবীগঞ্জের নিকট চৌকি নামক স্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন। গৌড় বাহিনী এই স্থানে মুসলিম বাহিনীকে পূর্বেকার ন্যায় গেরিলা কায়দায় আক্রমণ করিল। আক্রমণে এবারও তাহারা অগ্নিবান ব্যবহার করিল। কিন্তু কি আশ্চর্য! এবারের আক্রমণে একটি মুসলিম সৈন্যও নিহত কিংবা আহত হইল না বরং তাহাদের নিজেদের অগ্নিবানে নিজেরাই মরিতে লাগিল। নিক্ষিপ্ত অগ্নিবানে গৌড় সেনাদের বহু সংখ্যক মারা পড়িল, বহু আহত হইল। অবশিষ্ট যাহারা ছিল তাহারা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করতঃ কোনরূপে আত্মরক্ষা করিল। কি করিয়া এমন হইল ভোজবাজির রাজা গৌড় গোবিন্দ তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারিলেন না; মুসলিম সৈন্যরাও না। যিনি বুঝিলেন তিনি মুখে কিছুই বলিলেন না। "আল্লাহর অসাধ্য কিছুই নাই" ব্যস! এই বিশ্বাস লইয়াই তাহারা আবার সামনে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

যুদ্ধক্লান্ত মুসলিম বাহিনী ও সঙ্গী দরবেশগণসহ হযরত শাহ-জালাল এবার সতরসতী পরগনার অন্তর্গত ফতেপুর গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। হযরত শাহজালাল বাহিনীকে সেই স্থানে তাবু টানাইবার নির্দেশ দিলেন। রাত্রি

অতিবাহিত হইল। ভোরবেলা বাহিনীসহ ফজরের নামায সম্পন্ন করিয়া আবার তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং অনেক পথ অতিক্রম করিয়া বাহাদুরপুরের নিকট বারাক নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন।

নদী পার হইতে হইবে অথচ কোন যানবাহন নাই। খবর নিয়া জানা গেল, মুসলিম বাহিনীর অগ্রগতি প্রতিরোধ করিবার জন্য রাজা গোবিন্দ পূর্ব হইতেই এই স্থানে নৌকা চলাচল বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। শুনিয়া হযরত শাহজালাল হয়ত বা মনে মনে একটু হাসিলেন। কি সাধ্য রাজা গোবিন্দের যে মুসলিম বাহিনীকে বাধা দেয়! যে মহান আল্লাহ পর্বত হইতে নদী উৎপন্ন করিয়াছেন, যিনি অথৈ সমুদ্রের মধ্যে বিরাট বিরাট দ্বীপ সৃষ্টি করিয়া জনবসতির সুযোগ করিয়া দেন, তিনি এই সামান্য নদীটুকু পার হইবার মত ব্যবস্থা করিয়া দিবেন না?

মুসলিম বাহিনী ত নিছক দেশ জয় করিবার জন্য এতদূর পথ অতিক্রম করে নাই। তাহারা আসিয়াছে নির্যাতিত মুসলমানদিগকে নির্যাতনের কবল হইতে রক্ষা করিতে; ইসলামের জয়-পতাকা উড্ডীন করিয়া নিপীড়িত জনগণকে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় দিতে। সুতরাং আল্লাহ তাহাদের প্রতি বিমুখ হইবেন কেন?

সাধারণ সৈন্যরা কি মনে করিয়াছিল জানি না। হয়তঃবা ভাবিয়াছিল যে এ নদী অতিক্রম করিয়া ওপারে পৌঁছানো কিছুতেই সম্ভব হইবে না এবং গৌড় রাজ্য দখল করাও চলিবে না। কিন্তু মুরশিদ সাথে রহিয়াছেন। তাঁহার অবিচলিত বিশ্বাসে একটুও ব্যতিক্রম দেখা দেয় নাই। সুতরাং কার সাধ্য? তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে।

হযরত শাহজালাল স্বীয় মৃগচর্মের জায়নামায পানির উপর বিছাইয়া দিলেন। তিনি নিজেও উহাতে চড়িয়া নদী পার হইলেন, অনুচর দরবেশ ও গোটা বাহিনীকেও পার করাইলেন।

সৈয়দ নাসির উদ্দীন তখন নামে মাত্র সেনাপতি। যা কিছু নির্দেশ দেওয়ার, হযরত শাহজালালই নির্দেশ দান করেন। পীরের মাহাত্মে নাসির উদ্দীন নিজেও মুগ্ধ, সেনাদলও মুগ্ধ। কাহারও মুখে বিরুদ্ধতার আভাস নাই। বরং সকলেই তা'র প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তবুও হযরত শাহজালাল সরকারী নিয়মের ব্যতিক্রম করেন না। সকল কাজ তিনি পরামর্শ করিয়াই করেন এবং নির্দেশও সেনাপতি সৈয়দ নাসির উদ্দীনের মাধ্যমে জারী করেন। বলাবাহুল্য, যিনি ঐশী প্রেমে মুগ্ধ, বিভ্রান্ত মানুষকে সুপথে প্রতিষ্ঠিত করাই যাঁ'র এক-মাত্র কাম্য, তিনি পার্থিব সম্মান ও পদমর্যাদার মোহে আকৃষ্ট হইবেন কেন? তাঁ'র কাজ হেদায়াত করা, নির্যাতীত মানুষকে নির্যাতন দণ্ডের নাগপাশ হইতে মুক্তি দিয়া শান্তি ও ন্যায় নীতির সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় দান করা। এতটুকু হইলেই তিনি খুশী। পার্থিব সম্মানে তাঁ'র কি লাভ?

হযরত শাহজালাল বাহিনীকে যাত্রার নির্দেশ দিলেন। এবার তাহারা পূর্বদিকে যাত্রা করিয়া শেখ ঘাটের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত বর্তমান রেল ষ্টেশনের অদূরে সুরমা নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। নদী পারাপার এখানেও বন্ধ ছিল। সুচতুর রাজা মুসলিম বাহিনীর অগ্রগতি ব্যাহত করিবার জন্য যত প্রকার কৌশল অবলম্বন করা দরকার, তাহা করিতে একটুও শৈথিল্য করেন নাই। কিন্তু কি আসে যায় তাহাতে! আল্লাহর ওলীর কাছে এসব বাধা অতি তুচ্ছ। এবারেও তিনি পানিতে জায়নামায ভাসাইয়া গোটা বাহিনীকে পার করাইলেন ও নিজেও পার হইলেন।

মুসলিম বাহিনীর এই অগ্রগতি দেখিয়া রাজা গোবিন্দ একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। তাহার মনোবল তখন সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সম্রাট ফিরোযশাহ তুঘলক কর্তৃক প্রেরিত এক সহস্র অশ্বারোহী ও তিন সহস্র পদাতিক বাহিনীর সহিত মুকাবেলা করার মত শক্তি তাহার ছিল না। তবুও শেষ চেষ্টা করিয়া দেখা যাইত।

কিন্তু এই যে সাধক দরবেশ তাহাদের সাথে রহিয়াছেন, তাঁহার সাথে যুদ্ধ করা যায় কি ভাবে? তিনি ত অস্ত্র দিয়া যুদ্ধ করেন না. তিনি যুদ্ধ করেন আধ্যাত্মিক শক্তিবলে। গোবিন্দের সে শক্তি কোথায়? উপায় না দেখিয়া রাজা আবারও সেই ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন—

অধুনাযুগের মত তখন রাইফেল, কামান, বোমা দিয়া যুদ্ধ হইত না। ও সময় তাহা আবিষ্কৃত হয় নাই। তখন যুদ্ধ হইত ঢাল, তলোয়ার ও তীর ধনুক দিয়া। রাজা গোবিন্দের অস্ত্রাগারে একটি লৌহনির্মিত ধনুক ছিল। এযাবৎ কোন বীর পুরুষ উহাতে শরযোজনা করিতে সক্ষম হয় নাই। এবং কেহ উহাতে শরযোজনা করিতে পারে এ বিশ্বাসও তাঁহার ছিল না। তিনি সেই ধনুকটিকে হযরত শাহজালা-লের নিকট এই বলিয়া প্রেরণ করিলেন যে, মুসলিম বাহিনীর কোন লোক যদি এই ধনুকে শরযোজন করিতে পারে তবে তিনি বিনা যুদ্ধে শ্রীহট্টের শাসনভার তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইবেন। সিংহাসনের দাবী তিনি করিবেন না বা মুসলিম বাহিনীর কর্তৃত্বে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতাও সৃষ্টি করিবেন না। বলা বাহুল্য ইহা ছিল একটি প্রতারণামূলক কৌশল মাত্র। রাজা গোবিন্দ ভাবিয়াছিলেন এই ভাবেই হয়ত আত্মরক্ষা করা যাইবে এবং আত্মসম্মানও বজায় থাকিবে। কারণ মুসলিম বাহিনী যখন এই আশ্চর্যকর ধনুক দেখিবে এবং উহাতে শরযোজন করিতে পারিবে না তখন মনে করিবে রাজা গোবিন্দ নিশ্চয়ই অশেষ শক্তির অধিকারী এবং তাহাকে পরাস্ত করা আদৌ সম্ভব নয়। এইভাবে যদি তাহাদের অন্তরে একবার ভয়ের সঞ্চার করা যায় তাহা হইলে হয়ত বা তাহারা আর যুদ্ধ করিতে সাহসী হইবে না বরং সন্ধির প্রস্তাব পেশ করিবে।

কিন্তু রাজার ভুল হইয়াছিল। যাহারা শক্তির পূজারী, যাহারা শুধু বাহ্যিক শক্তিতেই বিশ্বাস করে তাহাদিগকে হয়ত এভাবে ভয় দেখানো যায়। কিন্তু যিনি দুনিয়ার কোন শক্তিকে পরোয়া করেন না,

যা'র সমগ্র অন্তর খোদা ভীতি ও ঐশী প্রেমে পরিপূর্ণ তিনি এই সামান্য শক্তিকে ভয় করিবেন কেন ? তাঁহার সমগ্র চেতনা ব্যাপিয়া একটি মাত্রই শব্দ—"আল্লাহু কাদেরুন" আল্লাহই সকল ক্ষমতার উৎস।

হযরত শাহজালাল সেনাবাহিনীর মধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন—যে ব্যক্তি সারা জীবনে কখনও আসরের নামায কাযা করে নাই, সে যেন আমার নিকট আগমন করে। কারণ, সে-ই ইহাতে শরযোজন করিতে সক্ষম হইবে। বলা বাহুল্য, হযরত শাহজালাল নিজেই একাজ করিতে পারিতেন। কিন্তু দুইটি কারণে তিনি তাহা করেন নাই। প্রথমঃ তিনি উহা দ্বারা ধর্মকাজে সৈন্য ও দরবেশবৃন্দের অতীত ইতিহাস যাচাই করিয়া দেখিতে ও তন্মধ্য হইতে খাঁটি লোকটিকে বাছাই করিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ এইভাবে কু-সংস্কারী রাজা গোবিন্দ ও তদীয় সৈন্যদের মনোভাব পরিবর্তন করাও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। কারণ, রাজা গোবিন্দ জানিতেন যে, একমাত্র সেই সাধুপুরুষের আধ্যাত্মিক বলেই বলীয়ান হইয়া মুসলিম বাহিনী সুদূর দিল্লী হইতে শ্রীহট্ট পর্যন্ত আসিতে সক্ষম হইয়াছে, অন্যথায় পদে পদে এত বাধা অতিক্রম করিয়া এত দূরে আসা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইত না। সুতরাং এমতাবস্থায় যখন রাজা দেখিতে পাইবেন যে, গুরুর একজন সাধারণ শিষ্যই উহা করিতে সক্ষম হইয়াছেন তখন গোটা মুসলিম বাহিনী সম্পর্কে তা'র ধারণা পরিবর্তিত হইয়া যাইবে এবং সেই সাথে তিনি নিজেই প্রভাবিত হইয়া পড়িবেন। ফলে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হওয়াও তা'র পক্ষে বিচিত্র নয়।

সমস্ত সৈন্যবিভাগ অনুসন্ধান করিয়া একটি মাত্র লোক পাওয়া গেল যিনি সারা জীবনে কখনও আসরের নামায কাযা করেন নাই। তিনি স্বয়ং প্রধান সেনাপতি সৈয়দ নাসির উদ্দীন। সৈয়দ নাসির উদ্দীনের ধর্মপরায়ণতা ও আধ্যাত্মিক সাধনা সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে তা'র পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

হযরত শাহজালাল নাসিরউদ্দীনের পরিচয় পূর্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন। এবার তা'র প্রতি তাঁর গভীর মনোযোগ অধিকতর আকৃষ্ট হইল। আনন্দিত চিত্তে তিনি তাঁ'র হাতে ধনুক দান করিয়া বলিলেন, যাও বাবা! আল্লাহর নাম লইয়া উহাতে শরযোজন কর। কি আশ্চর্য! এযাবৎ কোন মহা শক্তিধর বীর পুরুষ যে ধনুকে শরযোজন করিতে সাহসী হয় নাই, যাহার সম্পর্কে গোবিন্দের বিশ্বাস যে, পৃথিবীর কোন লোকই উহাতে শরযোজন করিতে সক্ষম নহে, গুরুর আদেশে তাহাই যেন নাসির উদ্দীনের কাছে অতি সহজ বলিয়া মনে হইল। তিনি বিসমিল্লাহ বলিয়া ধনুকে চাপ দিলেন। জ্যা বাঁকিয়া আসিল ও মধ্যবৃত্ত সম্প্রসারিত হইল। নাসিরউদ্দীন অনায়াসে উহাতে শরযোজন করিয়া মুরশিদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। হযরত শাহজালাল তখন সেই শরযোজিত ধনুক দূত মারফত রাজা গোবিন্দের নিকট প্রেরণ করিলেন। দেখিয়া গোবিন্দের অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। শেষ আশাটুকুও তিনি হারাইয়া ফেলিলেন। এই মহা সাধকের আধ্যাত্মিক শক্তির সামনে কিছুতেই টিকিয়া থাকা সম্ভব নহে, ইহা তিনি ভাল করিয়াই বুঝিলেন। তাই যুদ্ধ করা আর তিনি সমীচীন মনে করিলেন না। প্রাণভয়ে তিনি গড় দুয়ারে অবস্থিত নিজস্ব দুর্গে আশ্রয় নিলেন। এদিকে হযরত শাহজালাল রাজার প্রধান সেনাপতি মনারায়ের টিলার উপরিস্থিত দুর্গ প্রাসাদে গমন করিলেন ও শাহচট নামক তদীয় এক অনুচরকে তথায় আযান দিতে বলিলেন। দরবেশ শাহচট আযান দিতে আরম্ভ করিলেন। "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার" আল্লাহ মহান আল্লাহই শ্রেষ্ঠ···। সে আযান ত কতিপয় শব্দের সমষ্টি মাত্র ছিল না, উহাতে ছিল অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে উৎসারিত ও সুললিত কণ্ঠস্বর হইতে নিঃসৃত আল্লাহর বিজয় গানের তেজোদৃপ্ত ধ্বনি। যে ধ্বনির তেজ মনারায়ের লৌহ কঠিন দুর্গ প্রাসাদ সহ্য করিতে পারিল না। সেই মুহূর্তেই উহা ধ্বসিয়া পড়িল এবং যুগযুগান্তের সকল ইতিহাস অতিক্রম

করিয়া ভবিষ্যত মানব বংশধরদের জন্য এক অক্ষয় দৃষ্টান্ত হইয়া রহিল।

মনারায়ের দুর্গ প্রাসাদ ভাংগিয়া পড়ার সাথে সাথে মুসলিম সেনাবাহিনী আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলিয়া শ্রীহট্টে প্রবেশ করিল। কেহ বাধা দিল না, এতটুকু রক্তক্ষয় হইল না, বিনাযুদ্ধে শ্রীহট্ট মুসলমানদের অধিকারে আসিল। মনারায়ের টিলার চূড়ায় উড্ডীন হইল অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বিশিষ্ট সবুজ পতাকা। দিকে দিকে বিঘোষিত হইল ইস্‌লামের শান্তির বাণী, আল্লাহর মহিমা ধ্বনি—আল্লাহু আকবার।

বোরহানুদ্দীনের স্বপ্নসাধ পূর্ণ হইল, এতদিনে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। মুসলমানগণ স্বাধীনতা পাইয়াছেন, স্বাধীনভাবে ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে আর তাহাদের কোন বাধা নাই, পলে পলে নির্যাতন নিষ্পেষণের ভয় নাই। ইহার চাইতে বড় আনন্দ আর কি আছে! বোরহানুদ্দীন তথা সমগ্র মুসলিম সমাজ কৃতজ্ঞতাভরে আল্লাহর শোকর আদায় করিলেন।

রাজা গোবিন্দের সাধ

যে মহা সাধকের আধ্যাত্মিক শক্তি বলে মুসলিম সেনাবাহিনী অলৌকিক উপায়ে নদী পার হইয়া আসিল, যাঁহার আদেশে তাঁহারই একজন সাধারণ অনুচর লৌহ-ধনুতে শরযোজন করিয়া অসাধ্য সাধন করিল, যাঁ'র শিষ্যের আযান ধ্বনিতে মনারায়ের টিলাস্থিত লৌহ কঠিন দুর্ভেদ্য দুর্গপ্রাসাদ ধ্বসিয়া পড়িল, তাঁহাকে এক নজর দেখিবার সাধ কা'র না হয়। গৌড় গোবিন্দের সাধ হইল যে ভাবেই হউক, এই মহা সাধু-পুরুষকে একবার দেখিতে হইবে। কিন্তু কি ভাবে দেখা যায়—ধরা পড়িলে জীবন বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। বিজয়ী মুসলিম বাহিনী তাহাকে গ্রেফতার করিতে পারিলে এক দণ্ডের জন্যও তাহাকে পৃথিবীর আলোবাতাস

গ্রহণ করিতে দিবে না। ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা কারণ তাঁহার শাসনামলে মুসলমানগণ যে ভাবে নির্যাতীত হইয়াছে, যত কষ্ট তাহারা ভোগ করিয়াছে অন্য কোন শাসকের আমলে তাহারা এত কষ্ট ভোগ করে নাই। সুতরাং বিজয়ী সাধু পুরুষ যে তাহাকে এমনিই বিনা বিচারে ছাড়িয়া দিবেন সে আশা বাতুলতা মাত্র। রাজা গোবিন্দ ভাবনায় পড়িয়া গেলেন। কিন্তু কৌতুহল এমনি বস্তু যে, যাহার ঘাড়ে উহার ভূত চাপে সে কখনও স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। রাজা গোবিন্দ এক সাপুড়িয়ার সহিত বন্দোবস্ত করিলেন। বলিলেন, তুমি আমাকে তোমার পেটিকা অভ্যন্তরে আটকাইয়া বহন করিয়া লইয়া যাইবে। এবং সাপের খেলা দেখাইবার ছলে সেই সাধু পুরুষের নিকট লইয়া যাইবে। আমি যে পেটিকায় থাকিব তাহার ঢাকনা কখনও উন্মোচন করিবে না। অন্যান্য পেটিকা হইতে সাপ বাহির করিয়া খেলা দেখাইবে।

সিদ্ধান্ত মোতাবেক রাজা গোবিন্দ সাপুড়িয়ার পেটিকাভ্যন্তরে আত্মগোপন করিয়া রহিলেন। সাপুড়িয়া সাপের খেলা দেখাইবার ছলে তাহাকে বহন করিয়া মুসলিম সৈন্য শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

দিব্যজ্ঞান সম্পন্ন সাধক হযরত শাহজালাল রাজা গোবিন্দের এই গোপন অভিযানের কথা জানিতে পারিয়াছিলেন। সাপের খেলা দেখা তাঁহার উদ্দেশ্য নয় বা কোন খোদাপ্রেমিক সাধু-পুরুষই উহা পছন্দ করিতে পারে না, তথাপি হযরত শাহজালাল সাপের খেলা দেখিতে চাহিলেন। সাপুড়িয়া তাহার পেটিকাগুলি নামাইয়া রাখিল ও নির্দ্ধারিত পেটিকাটি ব্যতীত অন্যান্য পেটিকা হইতে সাপ বাহির করিয়া খেলা দেখাইতে উদ্যত হইল। হযরত শাহজালাল কোন ভূমিকা না করিয়া বলিলেন, গোবিন্দ! বাহির হইয়া আস! আর নয়, অনেক চাতুরী তুমি করিয়াছ, অনেক কৌশল খাটাইয়াছ, উহার একটিও তোমার কাজে লাগে নাই। এবার ভালয় ভালয় বাহির হইয়া আস, নতুবা নিজের বিপদ

নিজেই ডাকিয়া আনিবে। শুনিয়া রাজা গোবিন্দের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। এই সাধু পুরুষের কাছে যে কোন কিছুই গোপন থাকে না একথাটা তাহার আগেই বুঝা উচিত ছিল। কী বোকামীই না সে করিয়াছে! এখন উপায়? কিন্তু তখন আর চিন্তা করিবার সময় ছিল না। হযরত শাহজালাল বলিলেন, তোমার ভয় নাই গোবিন্দ! তুমি বাহির হইয়া আস।

নিরুপায় রাজা গোবিন্দ তখন ভয়ে ভয়ে পেটিকাভ্যন্তর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। সকলের দৃষ্টি তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইল। এই সেই রাজা গৌড় গোবিন্দ, যা'র অত্যাচারে প্রজাবৃন্দ সদা ভীত ও শংকিত থাকিত; মুসলমানদের প্রতি তাহার বিদ্বেষের অন্ত ছিল না। যা'র কুটনীতি ও সামরিক শক্তির কাছে প্রতাপশীল রাজারাও নতি স্বীকার করিত, আজ সে-ই কি না একজন নিরস্ত্র সাধক দরবেশের হাতে বন্দী।

হযরত শাহজালাল বলিলেন, গোবিন্দ! তোমার অতীত ইতিহাস তালাস করিয়া দেখ; উহা কলঙ্কের কালিমায় পরিপূর্ণ। তুমি ছিলে দেশের রাজা, আপামর জন সাধারণের সর্বপ্রধান নায়ক। তোমার কর্তব্য ছিল ন্যায়নীতি ও ন্যায়বিচার করিয়া দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু সে পথ অবলম্বন না করিয়া তুমি প্রজাদলন নীতি অবলম্বন করিয়াছিলে: তোমার অত্যাচারে দেশবাসী ক্ষুব্ধ; মুসলমানদের প্রতি তুমি যে নিষ্ঠুর নির্যাতন চালাইয়াছ উহার নযীর ইতিহাসের কোথাও নাই। তোমার শাস্তি হওয়া উচিত।

রাজা গোবিন্দ আর কি বলিবেন! ইহার একটি কথাও ত মিথ্যা নয়। তা'ছাড়া এই সাধু মহাজনের কাছে মিথ্যা বলিয়া নিষ্কৃতি পাইবারও ত উপায় নাই। অন্যথা দুই চারিটি মিথ্যা বলিয়াও নিজের সাফাই গাওয়া চলিত। রাজা গোবিন্দ নিজকৃত সকল অপরাধের কথা স্বীকার করিলেন ও তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া জীবন ভিক্ষা চাহিলেন।

ক্ষমা ? হাঁ, তোমাকে ক্ষমাই করা হইবে। ক্ষমা করাই যে খোদাপ্রেমিকের ধর্ম ! ক্ষমার সমান মহত্ব আর কিছুই নাই। তবে তোমার যদি সুবুদ্ধি জাগিয়া থাকে এবং তা'র পরিপ্রেক্ষিতে নিজ অতীত কার্যকলাপ লক্ষ্য করিয়া থাক তবে উহার অনুশোচনা তোমাকে তিলে তিলে দগ্ধীভূত করিবে। সে দহন জ্বালার হাত হইতে কেহই তোমাকে নিষ্কৃতি দিতে পারিবে না। যাও ! তুমি মুক্ত। কোন মুসলিম সেনা তোমাকে কিছুই বলিবে না।

এই স্থলে অতীব দুঃখের সহিত একটি কথা আমাদের আলোচনা করিতে হয়। হযরত শাহজালালের জীবনী সম্বলিত যতগুলি পুস্তক এ পর্যন্ত আমাদের নজরে পড়িয়াছে উহার কোনটিতেই রাজা গোবিন্দের প্রতি হযরত শাহজালালের 'ধর্ম প্রচারের' কোন কথার উল্লেখ নাই। অথচ স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে যে, হযরত শাহজালাল ত দেশজয়ের নিমিত্ত দেশ ভ্রমণে বাহির হন নাই। তিনি বাহির হইয়াছিলেন একমাত্র তাবলীগে দ্বীন বা ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে। অথচ রাজা গোবিন্দ যখন হযরত শাহজালালের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন তখন ত ইচ্ছা করিলেই তিনি তাহাকে মুসলমান বানাইতে পারিতেন। কারণ, সামরিক শক্তির কথা বাদ দিলেও ও সময় রাজা গোবিন্দের মনে হযরত শাহজালালের যথেষ্ট প্রভাব দাগ কাটিয়া বসিয়াছিল। —আমাদের মনে হয় জীবনী লেখকগণ এস্থলে হযরত শাহজালালের অলৌকিকত্ব দেখাইতে গিয়া তাঁহার "তাবলীগেদ্বীন'' এর কথা বে-মালুম ভুলিয়া গিয়াছেন। অথবা এমন হইতে পারে যে, হযরত শাহজালাল তাঁহাকে সত্য সত্যই ইসলামের প্রতি আহ্বান করেন নাই। কারণ, হয়তঃ তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, ব্যক্তি প্রভাবে প্রভাবান্বিত করিয়া কাহাকেও মুসলমান বানানো জবরদস্তির শামিল। অথচ ইসলামে কোনরূপ জবরদস্তি নাই। স্বেচ্ছায় যদি কেহ ইসলাম গ্রহণ করিতে চায় তবে তাহাকে ইসলামে দীক্ষিত করা যাইতে পারে। যাহা হউক, এবার গোড়ার কথায় ফিরিয়া আসি—

মুক্তি পাইয়াও রাজা গোবিন্দ নিজেকে নিরাপদ মনে করিতে পারিলেন না। সুদীর্ঘ কালের অত্যাচার ও কু-শাসনের ফলে মনে যে দুর্বলতা জমা হইয়াছিল তাহাই তাহাকে সংশয়াবিষ্ট করিয়া রাখিল। তিনি হযরত শাহজালালের আশ্বাসবাণীতে আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না। রাতের গোপন অন্ধকারে পলায়ন করিয়া শ্রীহট্ট হইতে সাত আটমাইল দূরে পেচাগড় দুর্গে তিনি আশ্রয় নিলেন। রাজা গোবিন্দের পরবর্তী ইতিহাস মাত্র এতটুকুই জানা যায়। ইহার পর আর তাহার সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। কোন কোন পুস্তকে আছে সিংহাসনচ্যুত হওয়ার পর তাহার শেষ জীবন কাল বড়ই দুঃখে কষ্টে অতিবাহিত হইয়াছিল। মুসলমানগণ কর্তৃক শ্রীহট্ট দখলের পর বিশ্বস্ত ভৃত্য ঝাড়ুরাম গোবিন্দের মাতা অর্পণা ও তা'র স্ত্রী শান্তি রাণীকে লইয়া গড়গাও পলায়ন করে। অসহায়া রাজমাতা ও রাজমহিষী সেখানে ঝাড়ুরামের তত্বাবধানে কাল কাটাইতে থাকেন, কিন্তু ভাগ্যের কি পরিহাস! একদিন ঝাড়ুরামও মুসলমানদের হাতে ধরা পড়ে এবং তাহাদের হাতেই সে নিহত হয়। ফলে রাজমাতা ও রাজমহিষী সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়া হইয়া পড়েন। এদিকে রাজা গোবিন্দেরও কোন সংবাদ নাই। তিনি বাঁচিয়া আছেন, কি মরিয়া গিয়াছেন সে বিষয়েও তাহারা কিছুই জানিতে পারেন নাই। রাজা গোবিন্দেরও সেই একই অবস্থা। তিনিও মাতা ও স্ত্রীর সম্পর্কে কোন কিছুই জানিতেন না। ইহার ফলে উভয় পক্ষ যে দারুণ মনোকষ্ট ভোগ করিতেছিলেন সম্ভবতঃ তাহাই তাহাদের জীবনে আনিয়া দিয়াছিল ঘোরতমসা। আর সেই ঘোরতমসাই একদিন তাহাদিগকে মৃত্যুর গহীন সাগরে প্রবেশ করাইয়াছিল।

রাজা গোবিন্দ চব্বিশ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাজত্ব কালে একসময়ে তাহার পেটে ব্রণ হইয়াছিল। অনেক চিকিৎসার পরেও যখন তিনি আরোগ্যলাভ করিতে পারিলেন না তখন তিনি

সুবিখ্যাত কবিরাজ চক্রপানি দত্তের শরণাপন্ন হইলেন। চক্রপানি দত্ত শ্রীহট্টে আসিলেন ও অনেক চেষ্টার পর তাহাকে সুস্থ করিয়া তুলিলেন। ইহার পর চক্রপানি দত্ত নিজ দেশে চলিয়া গেলেন। কিন্তু গোবিন্দ তাহাকে ছাড়িতে চাহিলেন না। অবশেষে তাঁর একান্ত অনুরোধে চক্রপানি দত্তের দুই পুত্র মহীপতি ও মুকুন্দ শ্রীহট্টে আসিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন। সাতগাঁওএ বর্তমানে যে দত্ত বংশ আছে তাঁহারা এই দুই ভাইএরই বংশধর।

হযরত শাহজালালের আস্তানা

শ্রীহট্ট বিজিত হইল, শাসন ক্ষমতা মুসলমানদের হাতে আসিল কিন্তু হযরত শাহজালাল নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। তিনিত দেশজয় করিয়া রাজা হইতে আসেন নাই, তিনি আসিয়াছেন বিভ্রান্ত পথহারা মানুষকে পথের সন্ধান দিতে। খোদার সৃষ্ট মানুষ খোদাকে ভুলিয়া শয়তানের অনুগামী হইয়াছে, পরজগতের কঠিন শাস্তির কথা ভুলিয়া ইহজগতের সুখ-শান্তি নিয়া মাতিয়া আছে, অচিরে ইহাদিগকে পথে আনিতে না পারিলে তাহাদের দুর্দশার অন্ত থাকিবে না। হযরত শাহজালাল চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কোথায় তাহার কর্মক্ষেত্র, কি ভাবে তিনি হেদায়াত কার্য আরম্ভ করিবেন এসব কথা চিন্তা করিতে তাঁহার কয়েকদিন চলিয়া গেল।

হযরত শাহজালালের মনে পড়িয়া গেল—গুরু তাহাকে একমুঠা মৃত্তিকা দান করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই মাটির অনুরূপ বর্ণ, গন্ধ ও স্বাদবিশিষ্ট মাটি যেখানে পাইবে, মনে করিবে, সেইটিই তোমার কর্মস্থল। সেখানেই স্থায়ী ভাবে আস্থানা গাড়িয়া তুমি কাজে লাগিয়া যাইবে। তিনি তদীয় শিষ্য চাশনী পীরকে সেই মাটি আনিতে বলিলেন। চাশ্‌নী পীর মাটি উপস্থিত করিলে হযরত শাহজালাল

শ্রীহট্টের মাটির সহিত উহা মিলাইয়া দেখিলেন। কি আশ্চর্য! শ্রীহট্টের মাটির বর্ণ ও স্বাদ গুরুপ্রদত্ত মাটির বর্ণ ও স্বাদের সহিত মিলিয়া গেল। আনন্দে তাঁহার বুক ভরিয়া গেল। তিনি খোদার শোকর করিলেন। বুঝিলেন, পরম শ্রদ্ধেয় মুরশিদ তাঁহাকে এই জায়গায়ই আস্তানা গাড়িয়া হেদায়াত কার্য চালাইতে নির্দেশ দিয়াছিলেন।—এতদিনে দরবেশের ভ্রমণ পিপাসা নিবৃত্ত হইল। তিনি স্থায়ীভাবে শ্রীহট্টে বসবাস করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। কিন্তু—

এদিকের কাজ তখনও বাকী। শ্রীহট্ট বিজয়ের পর হযরত শাহজালাল উহার শাসন ভার কাহাকেও অর্পণ করেন নাই। এবার তিনি সেইদিকে মনোনিবেশ করিলেন।

শ্রীহট্ট আগমন কালে হযরত শাহজালাল যে সব ভক্ত দরবেশ-বৃন্দকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে নূরুলহুদা আবুল কারামাত সাইদী হোছায়নী নামক একজন দরবেশও ছিলেন। তিনি যেমন বিচক্ষণ তেমনি খোদাভক্ত ছিলেন। মা'রেফাত সাধনায় তিনি অনেক উচ্চস্তরে পৌঁছিয়াছিলেন। রাজনৈতিক দুরদর্শিতা, শাসন দক্ষতা ও রাজকার্য পরিচালনায়ও তাঁ'র যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। হযরত শাহজালাল তাঁহার হাতেই বিজিত ভূমির শাসনভার অর্পণ করিলেন। পরবর্তীকালে ইনিই হায়দার গাযী নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

শাসনভার অর্পণ করার পর হযরত শাহজালাল অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। অতঃপর স্বীয় আস্তানা স্থাপনে মনোযোগী হইলেন। পাহাড়ের একটি উচ্চ টিলার উপর তাঁহার হুজরা নির্মিত হইল। নির্জন পরিবেশ, নীরব সাধনার জন্য এই জায়গাটি একদিকে যেমন বেশ উপযুক্ত ছিল অন্য দিকে ভক্তবৃন্দের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করারও যথেষ্ট সুযোগ ছিল। হযরত শাহজালাল জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত এই আস্তানা য়ই কাটাইয়াছিলেন।

তিনশত ষাট আউলিয়ার দেশ

আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছি যে, হযরত শাহজালাল যখন মক্কা মোয়াজ্জমা হইতে হিন্দুস্তানের দিকে যাত্রা করেন তখন তাঁহার সাথে বারজন দরবেশ অনুচররূপে যোগদান করিয়াছিলেন। অতঃপর যতই তিনি সামনে অগ্রসর হইতে থাকেন ততই তাঁহার ভক্ত শিষ্যের সংখ্যা বাড়িতে থাকে। শেষপর্যন্ত তাঁহার অনুচর দরবেশের সংখ্যা তিনশত এগারতে গিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু শ্রীহট্ট প্রবেশ করা পর্যন্ত তাঁহার অনুচর ভক্তের সংখ্যা কত হইয়াছিল তাহার কোন সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। অথচ লোকমুখে "শ্রীহট্ট তিনশত ষাট আউলিয়ার মুল্লুক" বলিয়া পরিচিত। কাজেই বুঝা যায় যে, শ্রীহট্ট পর্যন্ত পৌঁছিতে পৌঁছিতে হযরত শাহজালালের শিষ্যের সংখ্যা তিনশত ষাট এ গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। অথবা এমনও হইতে পারে যে, তিনি তিনশত এগার কিংবা তিনশত তেরজনঅনুচর দরবেশ নিয়াই শ্রীহট্ট আগমন করিয়াছিলেন, পরে এই দেশেরই লোক তাঁহার শিষ্যত্ব অর্জন করিয়া কামালিয়াত হাসিল করিয়াছিলেন এবং তাঁ'র ফলে তাঁহার ভক্তের সংখ্যা তিনশত ষাট এ উন্নীত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, এই তিনশত এগার বা তিনশত যাটজন ছিলেন হযরত শাহজালালের হাতে গড়া কামালিয়াত ও বেলায়েত প্রাপ্ত খাস্ শিষ্য। নতুবা তাঁহার সাধারণ শিষ্যের সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। ফুলের সুমধুর ঘ্রাণে মুগ্ধ হইয়া ভ্রমরেরা যেমন চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসে হযরত শাহজালালের সাহচর্য ও উপদেশবাণী লাভের জন্যও তেমনি চতুর্দিক হইতে দলে দলে লোকেরা ছুটিয়া আসিত। তিনি সদাহাস্যময় দরবেশ ছিলেন। তিনি যখন কথা বলিতেন তখন মনে হইত যেন তা'র কণ্ঠ হইতে মধু ঝরিয়া পড়িতেছে। তাঁহার মধুর ব্যবহার ও আধ্যাত্মিক সাধনায় মুগ্ধ হইয়া বহু হিন্দু মুসলমান হইয়াছিল।

হযরত শাহজালাল যে দায়িত্বভার বহন করিয়া হিন্দুস্তানে আগমন করিয়াছিলেন। সে দায়িত্ব পালন করা তাঁহার একার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তিনি কামালিয়াতপ্রাপ্ত খাস শিষ্যবৃন্দকে ইসলাম প্রচারের জন্য বিভিন্ন জায়গায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। ভক্ত শিষ্যবৃন্দ গুরুর আদেশ মোতাবেক স্ব-স্ব স্থানে থাকিয়া হেদায়েত ও তাবলীগ করিয়া বেড়াইতেন। কোথাও কোন জটিল প্রশ্ন দেখা দিলে ভক্ত শিষ্যগণ সাথে সাথে তাহা গুরুর নিকট ব্যক্ত করিতেন। শ্রদ্ধেয় গুরু পরম স্নেহভরে তাহাদিগকে উহা পুংখানুপুংখরূপে বুঝাইয়া দিয়া তাহাদের কর্তব্যকর্ম নির্দেশ করিতেন। সিলেটের বিভিন্ন স্থানে এইসব ভক্ত দরবেশের মাযার এখনও বিদ্যমান আছে। আল্লাহ-পাক তাওফীক দান করিলে যথাস্থানে তাঁহাদের নামের তালিকা ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হইবে।

তরফ বিজয়

তরফের শাসনকর্তা ছিলেন আচক নারায়ণ। মুসলমানদের প্রতি তাহার বিদ্বেষ ও বৈরী মনোভাবের কথা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। তিনি নূরুদ্দীন নামক জনৈক মুসলমানকে গো-হত্যার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন।

আচক নারায়ণকে পরাভূত করার জন্য বারজন দরবেশ বিশগাঁওয়ে গমন করেন। ইহাদের প্রধান অধিনায়ক ছিলেন সৈয়দ নাসিরউদ্দীন। কিন্তু ইনি কোন্ সৈয়দ নাসিরউদ্দীন তাহা সঠিকভাবে নির্ণয় করিবার উপায় নাই। কারণ, সিলেটে আজ যাহারা নিজেদেরে সৈয়দ নাসির উদ্দীনের বংশধর বলিয়া দাবী করে তাহাদের মধ্যে দুইটি দল দেখা যায়। এই উভয় দলের বংশ তালিকা পাঠ করিলে মনে হয় হযরত শাহজালালের সংগী, দিল্লী-সম্রাট ফিরোজশাহ তুঘলকের নির্বাচিত সিপাহসালার সৈয়দ নাসির উদ্দীন ও তরফ বিজেতা সৈয়দ নাসির

উদ্দীন একই ব্যক্তি নহেন। তবুও অনেকে মনে করেন যে, হযরত শাহজালালের সংগী সৈয়দ নাসির উদ্দীনই তরফ বিজেতা ছিলেন। কারণ, শাহজালালের সংগী সৈয়দ নাসির উদ্দীনকে যখন সিপাহ-সালার নির্বাচিত করা হয় তখন সম্রাট ফিরোজশাহ তুঘলক তাঁহাকে রাজা গোবিন্দ ও তরফের শাসনকর্তা আচক নারায়ণের মুসলিম নির্যাতনের কাহিনী বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন। হযরত শাহজালালেরও এ ঘটনা অবিদিত ছিল না। তা"ছাড়া সিপাহসালার সৈয়দ নাসির উদ্দীন তাঁহারই শিষ্য ছিলেন। সুতরাং তিনি অন্য কোন নাসির উদ্দীনকে তরফ বিজয়ের জন্য প্রেরণ করিবেন এমনটি আশা করা যায় না। তবে সেই নাসির উদ্দীন যদি হযরত শাহজালালের অন্য কোন শিষ্য হইয়া থাকেন তবে তরফ বিজয়ের জন্য তাঁহাকে প্রেরণ করাও বিচিত্র নয়। কিন্তু আমাদের তা' মনে হয়না। আমাদের ধারণায় সম্রাট ফিরোজশাহ কর্তৃক নির্বাচিত সিপাহসালার ও হযরত শাহজালালের সংগী নাসির উদ্দীনই তরফ বিজয়ের অধিনায়ক ছিলেন।

যাহা হউক সিপাহসালার সৈয়দ নাসির উদ্দীন তরফ বিজয়ের জন্য এক হাযার অশ্বারোহী ও তিন হাযার পদাতিক সৈন্য লইয়া জলপথে যাত্রা করিলেন। বারজন দরবেশ ওলীও তাঁহার সংগী হইয়াছিলেন। তাঁহার এই অভিযানের কথা জানিতে পারিয়া আচক নারায়ণ ভয় পাইয়া গেলেন। সামরিক শক্তি তাহার কম ছিল না, তবুও এই বিরাট বাহিনী ও তদসাথে সাধক দরবেশবৃন্দকে আগমনে তাহার মনোবল একেবারে ভাংগিয়া পড়িল। কারণ ইহার পূর্বে শ্রীহট্ট বিজয়ের ইতিহাস ও রাজা গোবিন্দের শোচনীয় পরিণতির কথা জানিতে পারিয়াছিলেন। সামরিক শক্তির সাথে যুদ্ধ করিয়া টিকিয়া থাকা গেলেও এই দরবেশ সাধু পুরুষদের আধ্যাত্মিক শক্তির সামনে টিকিয়া থাকা যাইবে না। সুতরাং পরাজয় যখন অনিবার্য, তখন খামাখা যুদ্ধ করিয়া রক্তক্ষয় করিয়া কি লাভ। তাই তিনি প্রাণভয়ে

সপরিবারে ত্রিপুরা রাজ্যে পলায়ন করিলেন এবং সেখানেই ত্রিপুরা রাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন।

বিনা রক্তপাতে তরফ মুসলমানদের দখলে আসিল। মুসলিম জনগণ 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি তুলিয়া সেনাদল ও দরবেশ সাধক-বৃন্দকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিল। ঘরে ঘরে উড্ডীন হইল অর্ধ চন্দ্রাকৃতিবিশিষ্ট সবুজ পতাকা। যে জায়গা এতদিন নূরুদ্দীনের মত শত শত মুসলিমের রক্তে রঞ্জিত হইয়াছিল। যাহা এতদিন নির্যাতন নিষ্পেষণের চারণভূমি হইয়া রহিয়াছিল তাহা আজ কালিমা-মুক্ত। মুসলিম দরবেশবৃন্দের প্রাণস্পর্শে উহা অধিকতর সজীব ও সতেজ হইয়া উঠিল। হযরত শাহজালাল এই জায়গার শাসনভার কাহাকে অর্পণ করিয়াছিলেন তাহা আমরা কোন পুস্তকে দেখিতে পাই নাই বলিয়া উল্লেখ করিতে পারিলাম না। তবে উপযুক্ত সুদক্ষ লোককেই যে শাসনভার দান করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, তিনি নিজে খোদাপ্রেমিক ছিলেন। আর খোদাপ্রেমিকের ধর্ম হইল মানুষের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হওয়া। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তরফের শাসনভার তিনি কোন জনদরদী শান্তিকামী লোককেই দান করিয়াছিলেন।

দরবেশগণ হযরত শাহজালালের নির্দেশক্রমে তরফেই রহিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা সেখানে স্থায়ীভাবে আস্তানা পাতিয়া ধর্মপ্রচার কার্যে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। এইজন্য তরফকে এখনও বার আউলিয়ার মুল্লুক বলা হইয়া থাকে।

হযরত শাহজালালের ধর্মনীতি ও রাজনীতির মূলকথা

অধুনাযুগে ধর্মকে রাজনীতি হইতে একেবারে দূরে সরাইয়া রাখা হইয়াছে। ইহার ফলে একদিকে যেমন ধর্ম কোনঠাসা হইয়া পড়িয়াছে অন্যদিকে তেমনি রাজনীতিও নিষ্প্রাণ হইয়া পড়িয়াছে। আজ প্রতিটি দেশে যে অশান্তি, অরাজকতা, মারামারি, কাটাকাটি ও যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতেছে উহার মূল কারণ ইহাই। যে ঘোড়ার লাগাম নাই তাহা অনাচারী হইতে বাধ্য। যে রাজনীতিতে ধর্মের স্থান নাই সে রাজনীতি উচ্ছৃংখলতায় ভরপুর। উহাদ্বারা মানুষের কল্যাণ যতটুকুই হউক, অকল্যাণ হয় বেশী।

হযরত শাহজালালের রাজনীতি ছিল ধর্মভিত্তিক। ধর্মের আলোকে তিনি রাজনীতি পরিচালনা করিতেন। ইসলাম-তথা আল্লাহর আইন তাঁহাকে যেরূপ নির্দেশ দিত, তিনি সেইভাবে রাজনীতি করিয়া মানুষের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হইতেন।

প্রিয় পাঠক পাঠিকাবৃন্দ যদি লক্ষ্য করিয়া থাকেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, কোনরূপ রক্তক্ষয় ছাড়াই কি ভাবে শ্রীহট্ট ও তরফ বিজয় সম্ভব হইল। সিকান্দর গাযীর সৈন্যবল যথেষ্ট থাকা সত্বেও কয়েকবারই তিনি শ্রীহট্ট বিজয়ের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছিলেন। শুধু সামরিক শক্তি তাঁহার কাজে আসে নাই। অতঃপর যখন সৈয়দ নাসির উদ্দীন (যিনি একজন উচুদরের ওলীও ছিলেন) সেনা বিভাগের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করিলেন এবং তদসাথে হযরত শাহজালালের মত মহান ওলীর আধ্যাত্মিক শক্তি মিলিত হইল তখন শ্রীহট্ট বিজয় সহজ হইয়া উঠিল এবং বিনা রক্তক্ষয়ে উহা মুসলমানদের দখলে আসিল। বলা বাহুল্য তরফ বিজয়ও এই উভয় শক্তির সমন্বয়ের ফলে সহজ হইয়াছিল। তারপর— ? বিজিত ভূমির শাসনভার অর্পণের

হযরত শাহজালালের ধর্মনীতি ও রাজনীতির মূলকথা

অধুনাযুগে ধর্মকে রাজনীতি হইতে একেবারে দূরে সরাইয়া রাখা হইয়াছে। ইহার ফলে একদিকে যেমন ধর্ম কোনঠাসা হইয়া পড়িয়াছে অন্যদিকে তেমনি রাজনীতিও নিষ্প্রাণ হইয়া পড়িয়াছে। আজ প্রতিটি দেশে যে অশান্তি, অরাজকতা, মারামারি, কাটাকাটি ও যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতেছে উহার মূল কারণ ইহাই। যে ঘোড়ার লাগাম নাই তাহা অনাচারী হইতে বাধ্য। যে রাজনীতিতে ধর্মের স্থান নাই সে রাজনীতি উচ্ছৃংখলতায় ভরপুর। উহাদ্বারা মানুষের কল্যাণ যতটুকুই হউক, অকল্যাণ হয় বেশী।

হযরত শাহজালালের রাজনীতি ছিল ধর্মভিত্তিক। ধর্মের আলোকে তিনি রাজনীতি পরিচালনা করিতেন। ইসলাম-তথা আল্লাহর আইন তাঁহাকে যেরূপ নির্দেশ দিত, তিনি সেইভাবে রাজনীতি করিয়া মানুষের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হইতেন।

প্রিয় পাঠক পাঠিকাবৃন্দ যদি লক্ষ্য করিয়া থাকেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, কোনরূপ রক্তক্ষয় ছাড়াই কি ভাবে শ্রীহট্ট ও তরফ বিজয় সম্ভব হইল। সিকান্দর গাযীর সৈন্যবল যথেষ্ট থাকা সত্বেও কয়েকবারই তিনি শ্রীহট্ট বিজয়ের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছিলেন। শুধু সামরিক শক্তি তাঁহার কাজে আসে নাই। অতঃপর যখন সৈয়দ নাসির উদ্দীন (যিনি একজন উঁচুদরের ওলীও ছিলেন) সেনা বিভাগের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করিলেন এবং তদসাথে হযরত শাহজালালের মত মহান ওলীর আধ্যাত্মিক শক্তি মিলিত হইল তখন শ্রীহট্ট বিজয় সহজ হইয়া উঠিল এবং বিনা রক্তক্ষয়ে উহা মুসলমানদের দখলে আসিল। বলা বাহুল্য তরফ বিজয়ও এই উভয় শক্তির সমন্বয়ের ফলে সহজ হইয়াছিল। তারপর—? বিজিত ভূমির শাসনভার অর্পণের

বেলায় দেখুন! হযরত শাহাজালাল ঠিক সেই লোককেই বিজিত ভূমির শাসনভার অর্পণ করিয়াছিলেন যিনি ধর্মে ও রাজনীতিতে উভয় দিক দিয়াই সুদক্ষ ছিলেন। অথচ তখন শ্রীহট্টে অনেক বড় বড় রাজনীতিবিদ ছিলেন, যাহারা রাজকার্য পরিচালনায় বিচক্ষণতা দেখাইতে পারিতেন। কিন্তু হযরত শাহজালাল তাহাদিগকে যোগ্য মনে করেন নাই, কারণ ধর্মে তাহারা কাঁচা ছিলেন।

বস্তুতঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)এর আদর্শও ইহাই ছিল। তিনি রাজনীতিকে কোনদিন স্বতন্ত্র করিয়া দেখেন নাই। উহাকে ধর্মের অঙ্গ বলিয়া মনে করিয়াছেন ও বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া বিশ্বমানবকে কল্যাণের সঠিক পথ নির্দেশ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে মদীনার মসজিদের কথা আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি। মসজিদকে আমরা ধর্মকর্মের বিশিষ্ট স্থান মনে করিয়া উহাকে খোদার ঘর বলিয়া থাকি। মসজিদে নামায ও কোরাআন তেলাওয়াত ছাড়া অন্যকথা বলা দোষের বলিয়া অভিহিত করি।

অথচ মদীনার মসজিদ ছিল ধর্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি যাবতীয় সুনীতি আলোচনার প্রাণকেন্দ্র। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একদিকে ছিলেন নবী, অন্যদিকে ছিলেন সমগ্র মদীনার সর্বাধিনায়ক। তাঁহাকে ধর্মালোচনাও করিতে হইত, আবার বিচার, মীমাংসা, মিটিং, আইন প্রণয়ন ইত্যাদি কাজও করিতে হইত। বলাবাহুল্য, এসকল কাজ তিনি মসজিদে বসিয়াই করিতেন। রাজকার্য পরিচালনার জন্য কোন স্বতন্ত্র ঘর বা প্রেসিডেন্ট ভবন ছিল না। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত তাঁহার সাথে দেখা করিতে আসিত, তিনি মসজিদে বসিয়াই তাহাদের সাথে আলাপ আলোচনা করিতেন। ওহুদের যুদ্ধ-কালে যখন কোরায়েশনেতা আবু সুফিয়ান বিরাট বাহিনী সহ মদীনা আক্রমণ করিতে আসে তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে-কেরাম-তথা মদীনার আপামর জন সাধারণকে ডাকিয়া মসজিদে বসিয়াই মিটিং করেন। খন্দকের যুদ্ধে যে সব মুসলমান আহত

হন, চিকিৎসার জন্য তাহাদিগকে মসজিদের বারান্দায় নিয়া আসা হয় এবং সেখানেই তাহাদের শুশ্রূষা চলে।

মদীনায় হিজরত করার পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) দেখিলেন, সেখানে কোন শাসনব্যবস্থা নাই। গোত্রপ্রধান নেতারা যাহা বলে গোত্রীয় লোকেরা তাহাই মানিয়া লয়। এক গোত্রের লোক অন্য গোত্রের নেতার আদেশ মানিয়া চলিতে রাজী নহে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ভাবিলেন, খোদা না করুন, এই অবস্থায় যদি মদীনা বহিঃশত্রুদ্বারা আক্রান্ত হয় তবে উহাকে রক্ষা করা কোনমতেই সম্ভব হইবে না। তাই তিনি মুসলমান, ইহুদী, খৃষ্টান ইত্যাদি সকল শ্রেণীর লোককে আহ্বান করিলেন এবং মসজিদে বসিয়া মিটিং করিলেন। এই মিটিং এ সকল শ্রেণীর লোকের ব্যক্তি স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা. নাগরিক অধিকার, দেশরক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি বহু বিষয়ে আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং সেই মোতাবেক কর্মসূচী প্রণয়ন করিয়া চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। ইহা ধর্মনীতি ও রাজনীতির সমন্বয় সাধন নয় কি? বস্তুতঃ উদ্দেশ্যের দিক দিয়া ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নাই। কারণ, ধর্মের মূল উদ্দেশ্য মানুষের আত্মিক উন্নতি সাধন করিয়া তাহাকে শান্তি ও কল্যাণকামী করিয়া গড়িয়া তোলা। কোন মানুষ অপর কোন মানুষের অহিত কামনা করিবে না, শান্তি নষ্ট করিবে না, অপরের স্বার্থের তুলনায় ব্যক্তি স্বার্থকে বড় করিয়া দেখিবে না বা অন্যের মর্যাদায় আঘাত হানিবে না। ইহাই ধর্মনীতির মূলকথা। রাজনীতির উদ্দেশ্যও অনেকটা তাই। তবে পার্থক্য এই যে, রাজনীতিতে আইনের রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করা হয় আর ধর্মনীতি প্রথম মানুষের আত্মার সংশোধন ঘটায় তৎপর তাহাকে আইনের আওতায় আনিয়া নিয়ন্ত্রিত করে। প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ আত্মার সংশোধন না করিয়া মানুষকে শুধু আইনের শৃংখল দ্বারা আবদ্ধ করিতে চাহিলে উহা কার্যকরী না-ও হইতে পারে। কারণ যে স্বভাব মানুষকে অনাচারী ও উচ্ছৃংখল

হইতে বাধ্য করে তাহা আইনের রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ করা সম্ভব নহে। পক্ষান্তরে যদি ধর্মনীতির আশ্রয়ে প্রথমে মানুষের কু-স্বভাব দূর করতঃ আত্মিক উন্নতি সাধন করিয়া আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা হয় তবে তাহাদ্বারা আইন লংঘিত হওয়ার সম্ভাবনা অতি কম থাকে। কাজেই শুধু রাজনীতি যেমন স্বয়ং সম্পূর্ণ নহে শুধু ধর্মনীতি অর্থাৎ নামায রোযা ইত্যাদি অনুষ্ঠানগুলিও তেমনি স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। এই উভয় নীতির সমন্বয়ে যে নীতি তাহাই পরিপূর্ণ ইসলাম এবং ইহাই মানুষের পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা।

হযরত শাহজালাল এই উভয়নীতির সমন্বয় সাধন করিয়া বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীহট্ট ও তরফ বিজয় যেরূপ সহজ হইয়াছিল উহার শৃখংলা বিধানও তদ্রূপ সহজ হইয়াছিল। বর্তমান কালের মত যদি ধর্মকে তিনি শুধু নামায রোযার মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করিতেন এবং রাজনীতিকে উহা হইতে আলাদা করিয়া দেখিতেন তবে আজ হয়ত শ্রীহট্টের ইতিহাস এত উজ্জলতায় ভরপুর থাকিত না, হয়ত বা তথায় এই সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত মুসলিম প্রাধান্যও টিকিয়া থাকিত না।

হযরত শাহজালালের দরবারে ইবনে বতুতা

ইবনে বতুতা বিখ্যাত পর্যটক ছিলেন। তিনি পদব্রজে পৃথিবীর বহুদেশ ভ্রমণ করেন। তাঁর নিজ বিবরণী হইতে জানা যায়—মক্কা মোয়াজ্জমায় হজ্জব্রত পালন করা কালে তাঁহার দেশ ভ্রমণের সাধ জাগে এবং ধর্মীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি যাত্রা শুরু করেন। সৌদী আরব, মিসর, সিরিয়া ইয়ামন, মরক্কো, লেবানন, তুরস্ক, চীন, জাপান, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, জাভা, সুমাত্রা ইত্যাদি বহুদেশ পর্যটন করেন। তিনি যখন ভ্রমণ আরম্ভ করেন তখন তিনি তরুণ যুবক মাত্র, কিন্তু ভ্রমণ শেষ করিয়া যখন

তিনি দেশে গিয়া পৌঁছান, তখন তাঁহার বয়স প্রৌঢ়ত্বের কোঠা প্রায় পার হওয়ার পথে। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, দেশ ভ্রমণে তাঁহার কত অনুরাগ ছিল।

শ্রীহট্ট বিজয় তখন সম্পন্ন হইয়াছে। হযরত শাহজালাল তপস্যা, সাধনা ও তাবলীগে দ্বীনের কাজে ব্যস্ত। এমনি এক সময়ে ইবনে বতুতা ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছেন। যানবাহন ছিল তা'র দুইখানা পা। পায়ে হাটিয়াই তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান সফর করেন এবং এক সময়ে সাতগাঁওয়ে আসিয়া পৌঁছেন। সাতগাঁও পৌঁছার পর তিনি স্থানীয় অধীবাসীদের মুখে হযরত শাহাজালালের মাহাত্ম ও অপূর্ব আধ্যাত্মিক শক্তির কথা শুনিতে পান। শুনিয়া এই মহা সাধককে দেখার জন্য তাঁহার প্রবল আগ্রহ জন্মে এবং তিনি সুদীর্ঘ একমাস কাল পায়ে হাটিয়া কামরূপের পার্বত্য অঞ্চলে পৌঁছেন।

দিব্যজ্ঞানী হযরত শাহজালালের ইহা জানিতে বাকী ছিল না। তিনি তদীয় চারজন অনুচরকে এই বলিয়া প্রেরণ করিলেন যে, দূরদেশীয় একজন পর্যটক দরবেশ আমার সাথে মোলাকাত করার উদ্দেশ্যে কামরূপ হইতে রওয়ানা করিয়াছেন। তিনি এখন অমুক জায়গায় আছেন, তোমরা তাঁহাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিয়া আমার কাছে নিয়া আস! —অনুচরবৃন্দ রওয়ানা করিলেন এবং চারদিনের পথ অতিক্রম করার পর যথাস্থানে তাঁহার দেখা পাইলেন। বলা আবশ্যক, হযরত শাহজালাল তাহাদিগকে তাঁ'র আকৃতি ও দৈহিক গঠনের সমুদয় বিবরণ বলিয়া দিয়াছিলেন।

ইবনে বতুতা আগন্তুক দরবেশ চতুষ্টয়ের পরিচয় জানিতে চাহিলে তাঁহারা বলিলেন যে, শ্রীহট্টে হযরত শাহজালাল নামে তাঁহাদের এক গুরু রহিয়াছেন, তাঁহার নির্দেশক্রমে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিতে আসিয়াছেন। শুনিয়া ইবনে বতুতা খুবই আশ্চর্যান্বিত হইলেন। যাহার সাথে জীবনে কোন দিন দেখা হয় নাই, যাহার

আগমন বার্তা সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত, তাহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করতঃ আগাইয়া নিয়া যাইবার জন্য এইভাবে লোক প্রেরণ করা তাঁহার কাছে বড়ই আশ্চর্যজনক বোধ হইল। তিনি বুঝিলেন, ইনি যে-ই হউন, কামেল ওলী তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। নতুবা কি ভাবে তিনি তাঁহার আগমন সংবাদ অবগত হইলেন! হযরত শাহজালের সন্দর্শণ লাভের জন্য ইবনে বতুতার আগ্রহ অধিকতর বৃদ্ধি পাইল।

ইবনে বতুতা আগত অনুচর দরবেশদের সহিত রওয়ানা করিলেন। সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর তাঁহারা শ্রীহট্ট পৌঁছিলেন। হযরত শাহাজালাল ইবনে বতুতাকে দেখিয়া সহাস্য বদনে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন।

ইহার পর শুরু হইল আলাপ। হযরত শাহজালাল তাঁহার কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার ভ্রমণকাহিনী সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ইবনে বতুতা সবিস্তারে তাহা বর্ণনা করিলেন। বলাবাহুল্য, ইবনে বতুতা হযরত শাহাজালালের সৌজন্য ও আন্তরিকতায় এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, দেশে ফিরিয়া যখনই তিনি কোন বন্ধুর সাথে আলাপ করিতেন তখনই কথায় কথায় হযরত শাহজালালের কথা উল্লেখ করিতেন—ইবনে বতুতা তিনদিন হযরত শাহজালালের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। ইবনে বতুতা যখন প্রথম দিন হযরত শাহজালালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন তখন তাঁহার গায়ে ছাগচর্ম নির্মিত একটি লম্বা জোব্বা দেখিতে পাইয়াছিলেন। বিদায় গ্রহণের পূর্বদিন তাঁহার মনে জাগিল, যদি হযরত শাহজালাল তাঁহাকে জোব্বাটি দান করেন তবে ভক্তিভরে তিনি উহা পরিধান করিবেন। কিন্তু সে কথা তিনি মুখ খুলিয়া বলিতে পারিলেন না। অতঃপর ইবনে বতুতা হযরত শাহ্জালালের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া যখন বাহিরে আসিলেন তখন তাঁহার এক অনুচর জোব্বাটি আনিয়া তাঁহার হাতে দিয়া বলিল,

শায়খ এই জোব্বাটি আপনাকে দিতে বলিয়াছেন। ইতিপূর্বে তিনি এই জোব্বা আর কখনও ব্যবহার করেন নাই। আপনার আসার দিন হইতে উহা ব্যবহার করিতেছেন। ইহার পূর্বে যখন তিনি জোব্বাটি তৈরী করেন তখন বলিয়াছিলেন, জোব্বাটি তাঁহার দোস্ত বুরহানুদ্দীন সাগরজীর জন্য তৈয়ার করা হইয়াছে। তিনি এখন চীন দেশে ইসলাম প্রচার কার্যে নিয়োজিত রহিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন—ইবনে বতুতা নামক একজন পর্যটক এখানে আগমন করিবেন। জোব্বাটি দেখিয়া তাঁহার খুব পছন্দ হইবে এবং তিনি মনে মনে উহা পাইবার আশা করিবেন কিন্তু মুখ খুলিয়া কিছুই বলিবেন না। আমি তাঁহাকে জোব্বাটি দান করিব। তারপর এক সময়ে উহা বুরহানুদ্দীনের হস্তগত হইবে।

শুনিয়া ইবনে বতুতা খুবই আশ্চর্যান্বিত হইলেন। বলিলেন, জোব্বাটি যখন আমাকেই দান করা হইয়াছে তখন আর আমি উহা কাহাকেও দিব না। দেখি কি প্রকারে উহা বুরহানুদ্দীন সাগরজীর হস্তগত হয়।

ইহার পর ইবনে বতুতা আবার ভ্রমণে বাহির হইলেন। সুদীর্ঘকাল ভ্রমণ করার পর এক সময়ে তিনি চীন দেশে গিয়া পৌঁছিলেন। চীনের খানসা শহরের রাজা ছিলেন অতি সুচতুর। জোব্বাটি দেখিয়া তাঁহার খুব পছন্দ হইল। তিনি কৌশলে জোব্বাটি ইবনে বতুতার নিকট হইতে ছিনাইয়া লইলেন। জোব্বাটি হারাইয়া ইবনে বতুতার খুব দুঃখ হইল, কিন্তু বিদেশ বিভুঁইয়ে তিনি কিইবা করিতে পারেন। কে তাঁহাকে সাহায্য করিবে। অগত্যা নিরাশ হইয়া তিনি আপন কর্তব্য কর্মে মনোনিবেশ করিলেন।

পরের বৎসর যখন আবার তিনি চীন সফরে আগমন করিলেন তখন তাঁহার মনে হইল যে, দরবেশ বুরহানুদ্দীন সাগরজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া যাই। সিদ্ধান্ত মোতাবেক তিনি এক সময় বুরহানুদ্দীন সাগরজীর আস্তানায় গমন করিলেন। দেখিলেন, ছাগ-চর্ম নির্মিত

একটি জোব্বা পরিধান করিয়া তিনি কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিতেছেন। ইবনে বতুতা তাঁহার কাছে গেলেন ও হাত দিয়া বার বার জামাটি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সাগরজী জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ব্যাপার? জোব্বাটি আপনি চিনেন নাকি? ইবনে বতুতা বলিলেন, হা চিনি বৈকি! কিন্তু ইহা কি ভাবে আপনার হস্তগত হইল? সাগরজী তখন হযরত শাহজালালের লেখা একখানা চিঠি দেখাইয়া বলিলেন, জোব্বাটি আমার দোস্ত হযরত শাহজালাল আমার জন্যই তৈরী করিয়াছিলেন। কিন্তু কর্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া আমাদের কাহারও অন্যত্র গমনের নির্দেশ নাই বলিয়া তিনি উহা এতদিন আমাকে দিতে পারেন নাই। তাই কি ভাবে আমার কাছে উহা পৌঁছিবে তাহা এই চিঠিতে সবিস্তারে লিখিয়া আমাকে জানাইয়াছেন।

শুনিয়া ইবনে বতুতা চিঠিখানা খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। যতই পড়েন ততই তাঁহার বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কবে ইবনে বতুতা ভারতবর্ষে সফর করিবেন, কখন কি ভাবে তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, কিভাবে তিনি জোব্বাটি তাঁহার নিকট চাহিয়া লইবেন, কিরূপে উহা খানসার বিধর্মী রাজা তাঁহার নিকট হইতে ছিনাইয়া লইবে এবং শেষপর্যন্ত কিভাবে উহা সাগরজীর হাতে গিয়া পৌঁছিবে, এসব কথা সবিস্তারে উহাতে লেখা রহিয়াছে। এই মহান ওলীর দিব্যজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় পাইয়া শ্রদ্ধায় তাঁহার মস্তক আপনা হইতে নত হইয়া আসিল।

হযরত শাহজালালের কয়েকজন বিখ্যাত অনুচর

আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি—হযরত শাহজালাল যখন ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তখন বারজন কামেল দরবেশ তাঁহায় সঙ্গ লইয়াছিলেন। শ্রীহট্ট পর্যন্ত পৌঁছিতে পৌঁছিতে অনুচর

শিষ্যের সংখ্যা তিনশত এগার কিংবা তিনশত তেরতে গিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু লোকমুখে "শ্রীহট্ট তিনশত ষাট আউলিয়ার মুল্লুক" বলিয়া কথিত হওয়ায় অনেকে মনে করেন যে, হযরত শাহজালালের শিষ্য সংখ্যা শেষপর্যন্ত তিনশত ষাট এ উন্নীত হইয়াছিল। নিম্নে উহাদের কয়েকজনের বিবরণ পেশ করা হইল :—

সিকান্দর খান গাযী

সিকান্দর খান গাযী সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোযশাহের ভাগিনেয় ছিলেন। ফিরোযশাহের নির্দেশক্রমে ইনিই সর্বপ্রথম শ্রীহট্ট বিজয়ের জন্য সসৈন্যে যাত্রা করেন। কিন্তু প্রতিকুল আবহাওয়ায় তাহার সৈন্যদের স্বাস্থ্য ভাংগিয়া পড়িলে তিনি অনেকটা হতোদ্যম হইয়া পড়েন এবং নূতন সৈন্য প্রেরণের অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া ফিরোযশাহের নিকট দূত প্রেরণ করেন। সম্রাট ফিরোযশাহ তাঁহার প্রতিকুল অবস্থা অনুধাবন করিয়া জ্যোতিষীদের পরামর্শ মোতাবেক সৈয়দ নাসিরউদ্দীনকে সিপাহসালার করিয়া পাঠান। সিকান্দর খান গাযীর মাযার সপ্তগ্রামে অবস্থিত। কেহ কেহ বলেন সুরমা নদীতে নৌকা ডুবির ফলে তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল। সুতরাং সপ্তগ্রামে তাহার মাযার হইতে পারে না। সলিলেই তাহার সমাধি রচিত হইয়াছিল।

সিপাহসালার সৈয়দ নাসিরউদ্দীন

ইনি বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন। সম্ভবতঃ কোন রাজনৈতিক কারণে তিনি বাগদাদ ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে আসেন এবং পাঠান সম্রাট ফিরোযশাহের অধীনে সেনাবিভাগে চাকরি নেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি আত্মীয়-স্বজনের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া স্বদেশ ত্যাগ

করেন। কিন্তু আমাদের তা'মনে হয় না। কারণ এহেন সরল-প্রাণ নীরব সাধু পুরুষের যে শত্রু থাকিতে পারে তাহা বিশ্বাস করিতে মন চায় না। আমাদের মনে হয় রাজনৈতিক কারণেই তিনি দেশ ত্যাগ করিয়াছিলেন। কারণ, বাগদাদের রাজনীতি ও সময় বেশ ঘোলাটে ছিল। রাজনৈতিক কোন্দলের কারণে বহু জ্ঞানী গুণী স্বদেশ ত্যাগ করিয়াছিলেন। খুব সম্ভব সৈয়দ নাসিরউদ্দীনও সেই ঘোলাটে রাজনীতির আবর্তে পড়িয়া দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সৈয়দ নাসিরউদ্দীন নীরব সাধক ছিলেন। হযরত শাহজালালের নিকট দীক্ষা গ্রহণের পূর্বে তিনি অন্য কাহারও নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না তাহা জানা যায় না। তবে সাধনা তাঁহার পূর্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছিল এবং তিনি কামালিয়াতের সোপানে উন্নীত হইয়াছিলেন। অন্যথা প্রবল ঝড়ের মধ্যেও তাঁহার ঘরের প্রদীপ নির্বাপিত না হওয়ায় অলৌকিকত্ব প্রকাশ পাওয়া সম্ভব হইত না। সেনাবিভাগে সাধারণ সৈনিক হিসাবে যোগদান করিয়া তিনি আত্মপরিচয় গোপন রাখিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতিভার বিকাশ আপনা হইতেই ঘটে, ফুলের গন্ধ কখনও ঠেকাইয়া রাখা যায় না। কয়েক বৎসর অতিক্রান্ত হইতেই তাঁহার পরিচয় আর গোপন রহিল না। সম্রাটের নিকট তিনি ধরা পড়িয়া গেলেন এবং সাধারণ সৈনিক হইতে সরাসরি প্রধান সেনাপতির পদে নিয়োজিত হইলেন। ইহার পর শ্রীহট্ট বিজয়ের উদ্দেশ্যে যাত্র করিয়া আকস্মিকভাবে পথে হযরত শাহজালালের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁ'র আধ্যাত্মিক শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁ'র শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শ্রীহট্ট বিজয়ের পর হযরত শাহজালাল তাঁহাকে সপ্তগ্রামে ফিরিয়া যাইবার নির্দেশ দেন। জীবনকাল পর্যন্ত এইস্থানেই থাকিয়া বিভ্রান্ত কু-সংস্কার-গ্রস্ত মানব মণ্ডলীকে ইসলামের আলোকে সঠিক পথ নির্দেশ করেন। সপ্তগ্রামেই তাহার মাযার অবস্থিত।

খাজা আদিনা

ইনি কামেল ওলী ছিলেন। হযরত শাহজালালের সাহচর্যে থাকিয়া ও তাঁহার আধ্যাত্মিক পরশ লাভ করিয়া তিনি কামালিয়াতের উচ্চ সোপনে পৌঁছিয়াছিলেন। তাঁহারই নামানুসারে সিলেট শহরে খাস দবীর মহল্লার উত্তর দিকে অবস্থিত একশত বিশ গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটির নাম আদিনা মসজিদ হইয়াছে। পাঞ্জেগানা ও জুমার নামায ছাড়াও এই মসজিদে ঈদুল ফেতর ও ঈদুজ্জোহার নামায আদায় করা হইত। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে ইস্‌পিন্‌দিয়ার খান কর্তৃক মসজিদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইস্‌পিন্‌দিয়ার খান ছিলেন তখন শ্রীহট্টের উপপ্রশাসক। কথিত আছে—সে বছর ঈদুজ্জোহা নামায উপলক্ষে মসজিদে আসিতে তাঁ'র খুব বিলম্ব হয়। ফলে মুসল্লীগণ তাঁহাকে বাদ দিয়াই ঈদের নামায আদায় করেন। ইহাতে রাগান্বিত হইয়া ইস্‌পিন্‌দিয়ার খান মসজিদটি ধ্বংস করিবার নির্দেশ দেন। ভগ্ন মসজিদের সেই অবশিষ্টাংশ কালের অতল গর্ভে একেবারেই বিলীন হইয়া যায় নাই। উহার ভগ্নাবশেষ এখন পর্যন্ত বিদ্যমান থাকিয়া ওলীয়ে কামেলের নাম ও মাহাত্ম ঘোষণা করিতেছে। আদিনা মসজিদের নিকটেই তাঁহার মাযার শরীফ অবস্থিত।

শাহযাদা আলী

ইনি ইয়ামনের রাজপুত্র ছিলেন। তাঁহার পিতা হযরত শাহজালালকে পরীক্ষা করার জন্য শরবত বলিয়া বিষ পান করিতে দেন। হযরত শাহজালাল আল্লাহর নাম লইয়া বিনা দ্বিধায় উহা পান করেন। বিষ তাঁহার কোন ক্ষতি করিতে পারিল না, বরং যিনি বিষ দান করিয়াছিলেন, কালবিষ তাহাকেই ধরিল। বিষ পান না করিয়াও বিষের প্রতিক্রিয়ায় তিনি মারা গেলেন। পিতার এই অপমৃত্যুতে শাহযাদা আলীর মনে বৈরাগ্য আসিয়া গিয়াছিল।

সংসার, রাজধর্ম কোনটিই তাঁহার ভাল লাগিল না। হযরত শাহজালালের অলৌকিকত্বে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে চাহিলেন, কিন্তু হযরত শাহজালাল তাঁহার আবেদন মঞ্জুর করিলেন না। নিরাশ হইয়া তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। চেষ্টা করিলেন, যাহাতে সংসার ধর্মে মন বসানো যায়। কিন্তু যে মন ঘরের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে তাহাকে আর ঘরে ফিরাইয়া আনা সম্ভব হইল না। তিনি একদা রাতের অন্ধকারে ঘর সংসার, রাজসিংহাসন সবকিছু পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহর নামে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং একাধারে চৌদ্দ দিন সফর করার পর হযরত শাহজালামের সংগে মিলিত হইলেন। হযরত শাহজালাল এবার আর তাঁহাকে নিরাশ করিতে পারিলেন না। পরমস্নেহে তিনি তাঁহাকে শিষ্যত্বে বরণ করিয়া লইলেন। শ্রীহট্টে হযরত শাহজালালের মাযারের পার্শ্বেই তাঁহার মাযার অবস্থিত। কামেল গুরুর যোগ্য শিষ্য বলিয়াই তিনি গুরুর মাযারের পার্শ্বে সমাহিত হইবার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছেন।

খাজা বুরহানুদ্দীন কাত্তাল

ইনি আরবদেশের অধিবাসী। হযরত শাহজালালের সংগী হইয়া তিনি শ্রীহট্টে আসেন ও এখানেই স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। তাঁহার পুত্র শাহজালালুদ্দীন ও পৌত্র কামালুদ্দীন উভয়ই আল্লাহর অলী ছিলেন। তাঁহার বংশ বর্তমানে মুফতী বংশ বলিয়া পরিচিত। কারণ এই বংশেরই হাসানমুহাম্মদ নামক একজন লোক সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মুফতী পদে অধিষ্ঠিত হন। সেই হইতে তাহার অধঃস্তন পুরুষেরা নিজেদেরে মুফতী বংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছে। সিলেট শহরের দরগাহ মহল্লায় এখন যাহারা নিজেদেরে মুফতী বংশীয় বলিয়া পরিচয় দেয় তাহারা খাজা বুরহানুদ্দীন কাত্তালেরই বংশধর।

নূরউল্লাহ

তাঁহার ডাকনাম শাহনূর। পরবর্তীকালে তিনি শাহচট নামে প্রসিদ্ধি লাভ করার দরুন তাঁহার আসল নাম ঢাকা পড়িয়া যায়। ইনি হযরত শাহজালালের আধ্যাত্মিক পরশে কামালিয়াতের উচ্চতম সোপানে উন্নীত হইয়াছিলেন। শ্রীহট্ট দখলের সময় হযরত শাহজালাল মনারায়ের টিলাস্থিত দুর্গ প্রাসাদের নিকট ইহাকেই আযান দিতে বলেন। তাঁহার সুললিত কণ্ঠের সুউচ্চ আওয়াযে মনারায়ের দুর্গ প্রাসাদ ভাংগিয়া পড়ে। বন্দরবাজার মাড়োয়ারী পট্টির পূর্ব-দক্ষিণ কোণে তাহার মাযার অবস্থিত।

চাশ্‌নী পীর

চাশ্‌নী পীরের আসল নাম জানা যায় না। তবে তিনি চাশ্‌নী পীর নামেই খ্যাত। কর্মস্থল নির্ণয়ের জন্য হযরত শাহজালালের দীক্ষাগুরু সৈয়দ আহমদ কবীর যে মৃত্তিকাটুকু তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন, যাত্রার প্রাককালে তিনি তাহা এই চাশ্‌নী পীরেরই নিকট দিয়াছিলেন। শ্রীহট্ট বিজয়ের পর হযরত শাহজালাল যখন নিজ কর্মস্থল * নির্ণয়ের জন্য আবার যাত্রার উদ্যোগ করিতেছিলেন তখন এই চাশ্‌নী পীরই শ্রীহট্টের মাটি ও হযরত সৈয়দ আহমদ প্রদত্ত মাটি জিহ্বা দ্বারা চাখিয়া পরীক্ষা করেন।

---

* পাঠকবর্গ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, হযরত শাহজালাল—যিনি দিব্যজ্ঞান বলে ইবনে বতুতার আগমন সংবাদ, এমনকি তাঁহার মনের সংবাদও জানিতে পারিলেন, আপন কর্মস্থল নির্ণয়ের জন্য তাঁহাকে গুরুপ্রদত্ত মাটির উপর নির্ভর করিতে হইল কেন? জবাব এই যে, দিব্যজ্ঞান বলে সবকিছুই জানা যাইবে এমন কোন কথা নাই। দিব্যজ্ঞান একপ্রকার শক্তি মাত্র। আল্লাহর যেকর, মোরাকাবা,

মোশাহাদা ইত্যাদি করিতে করিতে যখন মনের আয়না একেবারে স্বচ্ছ হইয়া যায় তখন এই শক্তি অর্জিত হয়। আরবীতে উহাকে কাশ্‌ফ বা অন্তর্দৃষ্টি বলা হয়। কিন্তু উহা স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। আল্লাহর ইচ্ছার উপর উহা নির্ভরশীল। আল্লাহ যখন ইচ্ছা করেন তখন তাহার মনের পরদা উন্মোচিত হয় এবং সেই শক্তির বিকাশ ঘটে। অতঃপর আল্লাহতাআলা তাহাকে উহার মাধ্যমে দূর ভবিষ্যতের অনেক গোপন রহস্য অবহিত করান।

হযরত শাহজালালের সে শক্তি ছিল। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল না বলিয়াই তাঁহার দিব্যজ্ঞান তখন কাজে আসে নাই। কিন্তু তবুও প্রশ্ন থাকিয়া যায়—আল্লাহ যাহাকে নির্দিষ্ট কোন জায়গার বেলায়েত দান করিলেন, তাঁহাকে সরাসরি সে জায়গার নাম জানাইয়া দিলেন না কেন? উত্তর এই যে, আল্লাহর প্রতিটি কাজের মধ্যে হেক্‌মত বা সূক্ষ্ম রহস্য নিহিত থাকে। তিনি হয়তঃ ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, গুরু প্রদত্ত মাটির অনুরূপ মাটি না পাওয়া পর্যন্ত হযরত শাহজালাল ভ্রমণ করিতে থাকুন। ইহার ফলে একদিকে তাঁহার দেশভ্রমণের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হইবে অন্যদিকে বিভিন্ন দেশের লোক তাঁহার সাহচর্যে আসিয়া হেদায়াত প্রাপ্ত হইবে ও পরে তাহারাই নিজ নিজ দেশে হেদায়াত-বাণী প্রচার করিবে। এভাবে গোটা পৃথিবীতে হেদায়াতের আলোক বিচ্ছুরিত হইবে। বস্তুতঃ হইয়াছিলও তাহাই। শ্রীহট্ট পৌঁছা পর্যন্ত তাঁহার বহু সংখ্যক শিষ্য জুটিয়াছিল; শ্রীহট্ট পৌঁছার পরেও বহু লোক তাঁহার শিষ্যত্ব অর্জন করিয়া কামেল হইয়াছিল। এবং পরে তিনি এই সব শিষ্য দ্বারা বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন জায়গায় হেদায়াত-কার্য চালাইয়াছিলেন।—তা'ছাড়া যাহাকে আল্লাপাক কামালিয়াত দান করেন তাহাকে তিনি সর্বদা সাধনার মধ্যে ডুবাইয়া রাখেন। দেশ ভ্রমণও সাধনার অন্তর্গত। দিব্যজ্ঞান বলে হযরত শাহজালাল যদি সরাসরি নির্দ্ধারিত জায়গাটির নাম জানিতে পারিতেন তবে এই সাধনা তাহার ব্যাপক হইত না।

পরীক্ষা ফলপ্রসু হইয়াছিল। গুরুপ্রদত্ত মাটির সহিত শ্রীহট্টের মাটির সামঞ্জস্যের কথা জানিতে পারিয়া হযরত শাহজালাল সেইখানেই স্থায়ীভাবে আস্তানা গাড়িয়াছিলেন। শ্রীহট্টের গোয়াইপাড়ায় একটি টিলার উপর চাশ্‌নী পীরের মাযার অবস্থিত।

শাহগাবরু

তাঁহার আসল নাম শেখ গরীব। তিনি বেলুচিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত শাহজালাল যখন দিল্লীতে নিযামুদ্দীন আউলিয়ার আস্তানায় অবস্থান করিতেছিলেন তখনই তাঁহার সহিত তিনি পরিচিত হন ও তাঁর শিষ্যত্ব অর্জন করিয়া অন্যান্য অনুচরদের সংগে একত্রে শ্রীহট্টে আগমন করেন। শ্রীহট্টে পৌঁছার পর হযরত শাহজালাল তাঁহাকে গাবুরটেকী নামক স্থানে বসতিস্থাপনের নির্দেশ দেন। পীরের আদেশে শেখ গরীব তথায় গিয়া হুজরা নির্মাণ করেন ও সেখানে ধর্মপ্রচার কার্যে নিয়োজিত হন। গাবুরটেকীর পীর ছিলেন বলিয়া পরবর্তীকালে তিনি শাহগাবরু নামে পরিচিত হন। তাঁর মাযারের সংগে আরও চারিজন দরবেশের মাযার আছে বলিয়া ঐ জায়গা এখন পাঁচ পীরের মাকাম বলিয়া খ্যাত।

শাহপরান

শাহপরান হযরত শাহজালালের ভাগিনেয় ছিলেন। মামার সংগেই তিনি শ্রীহট্টে আসিয়াছিলেন। তাঁর কামালিয়াত ও কারামাত সুপ্রসিদ্ধ ছিল।

কথিত আছে—প্রতিদিন তিনি দরগার একটি করিয়া কবুতর খাইতেন ও উহার পালকগুলি নিজ ঝুলির মধ্যে রাখিতেন। এইভাবে

যখন কবুতরের সংখ্যা কমিয়া আসিল তখন হযরত শাহজালাল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ব্যাপার, কবুতরের সংখ্যা এত কম কেন? তখন শাহপরান নিজ ঝুলি হইতে পালকগুলি বাহির করিয়া বাতাসে উড়াইয়া দিলেন। খোদার কি মহিমা! সংগে সংগে উহা কবুতর হইয়া উড়িয়া গেল।

হযরত শাহজালাল তাঁহার এই কারামাত দর্শন করিয়া বুঝিলেন, কামালিয়াতে তাঁহার চরম উন্নতি ঘটিয়াছে। বলিলেন, তোমার এখানে থাকিয়া আর কাজ নাই। অন্য কোথাও গিয়া হেদায়াত কার্যে আত্মনিয়োগ কর। সেমতে শাহপরান দক্ষিণকাছ চলিয়া যান এবং সেইখানে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করিয়া তাবলীগে দ্বীনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। দক্ষিণ কাছের চৌধুরীবংশ নিজেদেরে এই পীরের খাদেম বলিয়া দাবী করিয়া থাকে।

(শাহপরান সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পৃথক ভাবে পেশ করিতেছি)

মাখদুম রহীমউদ্দীন

ইনি কামেল দরবেশ ছিলেন। হযরত শাহজালালের শিষ্যত্ব বরণ করিয়া তিনি শ্রীহট্টে আসেন। কামালিয়াত হাসিল হওয়ার পর হযরত শাহজালাল তাঁহাকে তাবলীগে দ্বীনের জন্য জালালপুরে আস্তানা স্থাপনের নির্দেশ দেন। গুরুর আদেশে রহীমউদ্দীন সেখানে চলিয়া যান এবং বসতি স্থাপন করিয়া তথায় হেদায়াত কার্য চালাইতে থাকেন। জামালপুরে এখনও তাঁহার মাযার বিদ্যমান আছে। দরবেশ রহীমউদ্দীনের কারামাত সুপ্রসিদ্ধ ছিল। কথিত আছে—তিনি স্বীয় যষ্টিখানা জালালপুরের কোন এক জায়গায় পুতিয়া বসিলে ঐ স্থানে একটি বটবৃক্ষ জন্মে। উহার পাতার রস সেবন করিলে কঠিন ব্যাধিও নিরাময় হইত। দরগার ফকীরগণ এই বৃক্ষের পাতা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন লোককে বিতরণ করিয়া পয়সা উপার্জন করিত।

শাহ আলাউদ্দীন

ইনি পীরের আদেশে গহরপুর পরগনার আলাপুর গ্রামে বসতি স্থাপন করেন ও তথায় তাবলীগে দ্বীনের কাজ চালাইয়া যাইতে থাকেন। বলাবাহুল্য তাঁহার নামানুসারেই গ্রামের নাম আলাপুর হয়। তাঁহার বংশধরের মধ্যে শাহআলী নামক অন্য এক দরবেশ আধ্যাত্মিক সাধনা ও কারামাতে খুব খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

শেখ সামসুদ্দীন বেহারী

হযরত শাহজালালের অন্যতম শিষ্য ছিলেন শেখ সামসুদ্দীন বেহারী। সুনাইতা পরগনার অন্তর্গত আটঘর গ্রামে তিনি বসতি স্থাপন করেন। কামেল ওলী বলিয়া তাঁহার খুব খ্যাতি ছিল। তিনি যখন নামাযে মশগুল হইতেন তখন পার্থিব জগতের কোন ধারণা তাঁহার থাকিত না।

কথিত আছে—আটঘরে তখন একটি প্রতাপশালী বংশ ছিল। দুর্বৃত্ত পরায়ণতায় তাহারা খুব পাকা ছিল। শেখ সাহেবের কথায় তাহারা কান দিত না বরং উল্টা তাঁহার প্রতি মনে মনে শত্রুতা পোষণ করিত। একদিন তিনি ঐ ভাবে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া একাগ্র মনে নামায আদায় করিতেছিলেন, এমন সময়ে রাজানবাহা, কুজনবাহা, ও তাহাদের অপর পাঁচ ভাই আসিয়া তাঁহাকে বাঁধিয়া ফেলিল। শেখ সাহেবের নামাযে বিঘ্ন সৃষ্টি হইল, কিন্তু তিনি কিছুই বলিলেন না। বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া দুর্বৃত্তরা দেখে—তাহাদের এক ভাইর একটি কন্যা সন্তান মারা গিয়াছে। রোগ নাই, ব্যাধি নাই, হঠাৎ মৃত্যু! দুর্বৃত্তদের মনে ভাবোদয় হইল, না জানি শেখ সাহেবের সহিত দুর্ব্যবহারের কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। তাহারা ফিরিয়া আসিল ও শেখ সাহেবকে বন্ধন

মুক্ত করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। শেখ সাহেব মেয়েটির জন্য দোয়া করিলেন। খোদার মহিমা! মেয়েটি পুনর্জীবন লাভ করিল।

ইহার পর রাজানবাহা ও তা'র বংশীয় সকল লোক শেখ সাহেবের নিকট ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইল এবং সেই কন্যাটিকে তাঁহার সহিত বিবাহ দিয়া আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করিল।

শেখ সাহেবের পুত্র জিয়াউদ্দীনও কামেল ওলী ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে শেখ সাহেব তাঁহাকে একটি দীঘি খনন করিবার নির্দেশ দান করতঃ ওসীয়ত করিয়া যান যে, উহার পারেই যেন তাঁহাকে দাফন করা হয়। পুত্র জিয়াউদ্দীন তাঁহার সে ওসীয়ত পালন করিয়াছিলেন। সে দীঘিটি এখন জিয়াউদ্দীনের দীঘি নামে পরিচিত। উহার পারেই শেখ শামসুদ্দীন বেহারীর মাযার অবস্থিত।

শাহবদর

তাঁহার আসল নাম সৈয়দ বদরুদ্দীন। কিন্তু শাহবদর ও বদরশাহ বলিয়াই সমধিক প্রসিদ্ধ। যে বারজন দরবেশ সৈয়দ নাসিরউদ্দীনের সঙ্গে তরফ বিজয় করিতে গিয়াছিলেন ইনি তাঁহাদেরই একজন। তরফ বিজয়ের পরে পীরের হুকুম নিয়া তিনি বদরপুর নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন ও তথায় ইসলাম প্রচার করিয়া বহু অমুসলিমকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। আধ্যাত্মিক শক্তি ও অলৌকিকত্বে তিনি খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ঐ সময় বদরপুরের নিকটে বরাক নদীর বাঁকে খুব ঢেউ জাগিত। যা'র ফলে এই জায়গা দিয়া নৌকা চলাচল করা একরূপ অসম্ভব ছিল। বহু নৌকা মারা পড়িত। যাহার ভাগ্য ভাল সে হয়তঃ কোনক্রমে বাঁচিয়া যাইত। এইজন্য মাঝি-মাল্লারা যখনই এইস্থান দিয়া নৌকা চালাইয়া নিতে চাহিত তখনই তীরে উঠিয়া শাহবদরের নামে শিরনী

বিতরণ করিয়া যাইত। চট্টগ্রামে শাহবদর নামে যে পীরের খ্যাতি শুনিতে পাওয়া যায় সম্ভবতঃ ইনিই সেই শাহবদর। ইসলাম প্রচার কার্যে তিনি চট্টগ্রাম গিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানে তিনি স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন নাই। বদরপুর রেলষ্টেশনের সন্নিকটে তাঁহার মাযার অবস্থিত। বহুযুগ পার হইয়া গিয়াছে তবুও আজ পর্যন্ত লোকেরা বহু দূর দুরান্তর হইতে আসিয়া ভক্তি-ভরে তাঁহার মাযার শরীফ যেয়ারত করিয়া থাকে। সাধারণ লোকের বিশ্বাস—আল্লাহর নামে কোন কিছু মানত করিয়া শাহ-বদরের মাযারে দান করিলে উদ্দেশ্য যথাশীঘ্র হাসিল হয়।

শাহ হেলিমুদ্দীন

ইনি সুবিখ্যাত কামেল ওলী ছিলেন। তাঁহার জন্মস্থান সম্পর্কে ইতিহাসবেত্তাদের মধ্যে মতদ্বৈধতা পরিদৃষ্ট হয়। কেহ বলেন, তিনি ইয়ামনে জন্মলাভ করিয়াছিলেন, কেহ বলেন, তিনি মধ্য প্রদেশের নারনুলের অধিবাসী। তিনি হযরত শাহজালালের অনুচররূপে শ্রীহট্ট আগমন করিয়াছিলেন। মা'রেফাত সাধনায় যখন তাঁহার কামালিয়াত হাসিল হয় তখন হযরত শাহজালাল তাঁহাকে ধর্মপ্রচারের জন্য ত্রিপুরা রাজ্যে প্রেরণ করেন।

ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত কৈলা শহরের সামন্ত নৃপতি ছিলেন আসলাম রায়। আসলাম রায় একদিন বাঘ শিকার করিতে গিয়া জাল ফেলিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময়ে শাহ হেলিমুদ্দীন তথায় গমন করিলেন। সামন্ত রাজার সাথে তাঁহার আলাপ হইল। তাঁহার আগমনোদ্দেশ্য তিনি অবগত হইলেন। শাহ হেলিমুদ্দীন তখন গভীর অরণ্যে চলিয়া গেলেন। হাতে কোন অস্ত্র ছিল না। খালি হাতেই তিনি একটি বাঘ ধরিয়া আনিয়া রাজার সামনে উপস্থিত করিলেন ও পরে উহাকে তাড়াইয়া দিলেন।

ইহা দেখিয়া সামন্তরাজ আসলাম রায় বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। মানুষেও কি এমন কাজ করিতে পারে! রক্তপিপাসু হিংস্র বাঘকে খালি হাতে ধরিয়া আনা কি সোজা ব্যাপার! ইনি মানুষ, না ফেরেশতা! রাজা এই দরবেশের আধ্যাত্মিক শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিজ এলাকায় ধরিয়া রাখিবার জন্য বসতি স্থাপনের নিমিত্ত কিছু জমি দিতে ইচ্ছুক হইলেন। দরবেশ বলিলেন, আপনার বেরী হইতে একটি তীর নিক্ষেপ করিলে উহা যতদূর গিয়া পৌঁছে ততটুকু জমি যদি আপনি আমাকে দান করিতে পারেন তাহা হইলে আমি আপনার কথায় রাজী হইতে পারি। রাজা আসলাম রায় তাহাতেই রাজী হইলেন। দরবেশ নিজেই তীর নিক্ষেপ করিলেন। বেরী হইতে অনেক দূরে গিয়া একটি গাছের সহিত উহা বিদ্ধ হইল। যে গ্রামে উক্ত গাছটি ছিল তাহার নাম হইল তীরপাশা। রাজা আসলাম রায় তাঁহার বেরী হইতে তীরপাশা পর্যন্ত সবটুকু জমি তাঁহাকে দান করিলেন।

ইহার পর দরবেশ মনু নদীর পশ্চিম পাড়ে বসতি স্থাপন করিয়া সাধনায় মগ্ন হন। তাঁ'র পুত্র শাহ্মালিকও পিতার সাহচর্যে থাকিয়া মা'রেফাত সাধনায় প্রভূত উন্নতি লাভ করেন। পিতা ও পুত্রের প্রচেষ্টায় ঐ এলাকার বহুলোক কু-সংস্কার পরিত্যাগ করিয়া সত্যের আলোকে আলোকিত হয়।

কথিত আছে—একদিন রাজা আসলাম রায় স্বপ্নে দেখিলেন যে, তাঁহার ঘরের একটি প্রদীপ বাহির হইয়া দরবেশ শাহ হেলিলুদ্দীনের হুজরায় গিয়া প্রবেশ করিয়াছে এবং তিনি নিজেও সেই প্রদীপের সাথে সাথে বাহির হইয়া দরবেশের আস্তানায় গিয়াছেন। স্বপ্ন দেখিয়া কু-সংস্কারী রাজার মনে খটকা লাগিল। তিনি ভাবিলেন, সুখের দিন শেষ হইয়াছে। এবার কষ্টের পালা। রাজ্য, রাজত্ব হয়তঃ বা সবকিছুই চলিয়া যাইবে। কাজেই সময় থাকিতে ব্যবস্থা করা দরকার। তিনি দরবেশের আস্তানায় গমন করিলেন ও স্বপ্ন-

তাহারা প্রতিদিন দলে দলে হাযীর হইয়া রাজার নিকট নিজেদের দুর্দশার কথা জানাইতে লাগিল। রাজা চন্দ্রনারায়ণ মহা ভাবনায় পড়িলেন। কি ভাবে বাঘটিকে হত্যা করা যায় তাহা এক মহা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল।

রাজা যখন বাঘ তাড়ানো নিয়া ব্যস্ত, তখন তাঁহার আরেক বিপদ দেখা দিল। একটি বিরাট বিষধর সাপ তাঁহার সিংহাসনের উপর ফণা উঁচু করিয়া এমন ভাবে বসিয়া রহিল যে, উহার গায়ে হাত দিবার সাহস কাহারও হইল না।

কি আশ্চর্য! সিংহাসনের উপর সাপ! এরূপ ঘটনা কেহ কোন দিন দেখেও নাই, শুনেও নাই। হঠাৎ রাজার মনে পড়িয়া গেল, কিছুদিন পূর্বে এক মুসলিম ফকীর তাঁহার নিকট কিছু জমি চাহিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাহা দিতে স্বীকৃত হন নাই। তাঁহার মনে হইল হয়তঃ বা ইহা সেই ফকীরের কারামতী। জমি না দেওয়ার কারণে হয়তঃ তিনি ক্ষুব্ধ হইয়া এই বাঘ ও সাপ পাঠাইয়া দিয়াছেন।

নিরুপায় রাজা চন্দ্রনারায়ণ তখন বাধ্য হইয়া ফকীরের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি স্বয়ং তাঁহার আস্তানায় হাযীর হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ও এ ব্যাপারে তাঁহাকে সাহায্য করার জন্য আবেদন পেশ করিলেন।

দরবেশ সৈয়দ শাহমোস্তফা তখন বাঘটিকে ডাকিয়া তাহার পিঠে চড়িলেন ও সাপটিকে চাবুকরূপে ব্যবহার করিয়া বাঘ চালনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই অত্যাশ্চর্য কাণ্ড দেখিয়া রাজার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তিনি দরবেশকে তাঁহার নিজস্ব রাজবাড়ী ছাড়িয়া দিলেন। শুধু তাহাই নয়, তদীয় একমাত্র রাজকন্যাকেও তিনি তাঁহার সহিত বিবাহ দিয়া আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করিলেন। বিবাহের পূর্বে দরবেশ তাঁহাকে মুসলমান বানাইয়া সালেমা খাতুন নাম রাখিয়াছিলেন। ইহার পর রাজা চন্দ্রনারায়ণ পূর্বোক্ত রাজবাড়ী নির্মাণ করিয়া তথায় বসবাস করিতে থাকেন। জীবনকাল পর্যন্ত

সৈয়দ শাহমোস্তফা

ইনি ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলীর (কাঃ) বংশধর ছিলেন। তাঁহার পূর্বপুরুষ মক্কা মোয়াজ্জামা হইতে বাগদাদ চলিয়া আসে। বাগদাদেই তাঁহার জন্ম এবং সেখানেই তিনি শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তিনি হযরত শাহজালালের আধ্যাত্মিক প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব অর্জন করেন ও অনুচররূপে তাঁহার সাথে শ্রীহট্টে আগমন করেন।

অতঃপর যখন তাঁহার কামালিয়াত হাসিল হইল তখন হযরত শাহজালাল তাঁহাকে ধর্মপ্রচারের নির্দেশ দান করেন। পীরের আদেশে সৈয়দ শাহমোস্তফা ধর্মপ্রচারে বাহির হন এবং বহু জায়গা সফর করিয়া অবশেষে মোস্তফাপুরে আগমন করিলেন। বলাবাহুল্য তাঁহারই নামানুসারে জায়গাটির নাম মোস্তফাপুর হইয়াছিল।

ঐ সময় ত্রিপুরা রাজ্যের অধীন বষিজুড়ার পার্বত্য অঞ্চলে চন্দ্রনারায়ণ নামে এক সামন্তরাজ রাজত্ব করিতেন। তিনি খুব দাম্ভিক ও উচ্চাভিলাষী ছিলেন। সৈয়দ শাহমোস্তফা যে জায়গায় থাকিয়া তখন ধর্মপ্রচার করিতেছিলেন, সে জায়গাটি ছিল উক্ত রাজার এলাকাধীন। কাজেই ধর্মপ্রচারের কেন্দ্ররূপে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপনের নিমিত্ত তিনি রাজা চন্দ্রনারায়ণের নিকট কিছু জমি চাহিলেন। কিন্তু হিন্দু রাজা তাঁহাকে জমি দিতে স্বীকৃত হইলেন না। ইহার পর বেশ কিছুদিন কাটিয়া গেল। দরবেশ আপন মনে তাবলীগে দ্বীনের কাজে ব্যস্ত রহিলেন।

এদিকে রাজা চন্দ্রনারায়ণের বিপদ দেখা দিল। এতদিন বেশ নির্বিঘ্নেই কাল কাটিয়াছিল কিন্তু হঠাৎ কোথা হইতে একটি হিংস্র বাঘ আসিয়া রাজ্য মধ্যে উপদ্রব শুরু করিয়া দিল। প্রতিদিনই একজন না একজন মারা পড়িতে লাগিল। কখন কাহার ঘরে আসিয়া হানা দেয় তাহার নিশ্চয়তা নাই। সমস্ত লোক আতংকে ম্রিয়মান।

তাহারা প্রতিদিন দলে দলে হাযীর হইয়া রাজার নিকট নিজেদের দুর্দশার কথা জানাইতে লাগিল। রাজা চন্দ্রনারায়ণ মহা ভাবনায় পড়িলেন। কি ভাবে বাঘটিকে হত্যা করা যায় তাহা এক মহা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল।

রাজা যখন বাঘ তাড়ানো নিয়া ব্যস্ত, তখন তাঁহার আরেক বিপদ দেখা দিল। একটি বিরাট বিষধর সাপ তাঁহার সিংহাসনের উপর ফণা উঁচু করিয়া এমন ভাবে বসিয়া রহিল যে, উহার গায়ে হাত দিবার সাহস কাহারও হইল না।

কি আশ্চর্য! সিংহাসনের উপর সাপ! এরূপ ঘটনা কেহ কোন দিন দেখেও নাই, শুনেও নাই। হঠাৎ রাজার মনে পড়িয়া গেল, কিছুদিন পূর্বে এক মুসলিম ফকীর তাঁহার নিকট কিছু জমি চাহিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাহা দিতে স্বীকৃত হন নাই। তাঁহার মনে হইল হয়তঃ বা ইহা সেই ফকীরের কারামতী। জমি না দেওয়ার কারণে হয়তঃ তিনি ক্ষুব্ধ হইয়া এই বাঘ ও সাপ পাঠাইয়া দিয়াছেন।

নিরুপায় রাজা চন্দ্রনারায়ণ তখন বাধ্য হইয়া ফকীরের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি স্বয়ং তাঁহার আস্তানায় হাযীর হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ও এ ব্যাপারে তাঁহাকে সাহায্য করার জন্য আবেদন পেশ করিলেন।

দরবেশ সৈয়দ শাহমোস্তফা তখন বাঘটিকে ডাকিয়া তাহার পিঠে চড়িলেন ও সাপটিকে চাবুকরূপে ব্যবহার করিয়া বাঘ চালনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই অত্যাশ্চর্য কাণ্ড দেখিয়া রাজার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তিনি দরবেশকে তাঁহার নিজস্ব রাজবাড়ী ছাড়িয়া দিলেন। শুধু তাহাই নয়, তদীয় একমাত্র রাজকন্যাকেও তিনি তাঁহার সহিত বিবাহ দিয়া আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করিলেন। বিবাহের পূর্বে দরবেশ তাঁহাকে মুসলমান বানাইয়া সালেমা খাতুন নাম রাখিয়াছিলেন। ইহার পর রাজা চন্দ্রনারায়ণ পূর্বোক্ত রাজবাড়ী নির্মাণ করিয়া তথায় বসবাস করিতে থাকেন। জীবনকাল পর্যন্ত

তিনি দরবেশের ভক্ত ছিলেন বটে, তবে মুসলমান হইয়াছিলেন কি না তাহা সবিশেষ জানা যায় না।

সুদীর্ঘ কাল ইসলামের খেদমত করিয়া সৈয়দ শাহমোস্তফা মোস্তফাপুরের মাটিতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সেখানেই তাঁহার মাযার অবস্থিত।

শাহগীর

তাঁহার আসল নাম সৈয়দ আহমদ গেছুদরাজ। দরবেশ শাহ-পরানের ন্যায় ইনিও হযরত শাহজালালের ভাগিনেয় ছিলেন ও সাধনা করিয়া কামালিয়াতের উচ্চ সোপানে পৌঁছিলেন। তিনি তরফ অভিযানে যোগদান করিয়া শাহাদাত বরণ করেন।

হযরত শাহজালাল তাঁহাকে খুব স্নেহ করিতেন। ভাগিনেয় বলিয়া নয়, আধ্যাত্মিক সাধনায় তাঁহার অনুরাগ, ইসলামী প্রেরণা ও তাবলীগে দ্বীন সম্পর্কে তাঁ'র উচ্চ ধারণার কথা জানিতে পারিয়াই তাঁহার প্রতি তিনি একটু বেশী অনুরাগী ছিলেন। যোগ্য মামার যোগ্য ভাগিনেয় ছিলেন তিনি। তাঁহার সদাহাস্যময় মুখাবয়ব হইতে যেন আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হইত। যেমন সুন্দর কান্তি, তেমনি সরল মধুর প্রাণ। অথচ জেহাদের আহ্বানে উন্মাদ। সেখানে তিনি অমিত তেজা সিংহ বীর পুরুষ। সাধনা জগতে তাঁহার স্থান ছিল অতি উচ্চে। তিনি সুলতানুল আয্‌কার হাসিল করিয়াছিলেন।

কথিত আছে, শহীদ হওয়ার পর তাঁহার ছিন্ন মস্তক নদী পথে তরফ হইতে খড়মপুর পর্যন্ত ভাসিয়া আসিয়াছিল। চৈতনদাস নামক এক জেলে ও তাহার অপরাপর সংগীরা মাছ ধরিবার নিমিত্ত জাল পাতিয়া রাখিয়াছিল, মস্তকটি তাহাতে আটকা পড়ে। তাজা ছিন্ন মস্তক দেখিয়া চৈতনদাস উহা উঠাইয়া লয়, কিন্তু কি আশ্চর্য ! ছিন্ন মস্তক হইতে তখনও যেকেরের আওয়ায বাহির হইতেছিল এবং তাহা পরিষ্কার শুনা যাইতেছিল। চৈতনদাস ও তাহার সঙ্গী জেলেদের

মধ্যে যাহারা উহা স্বকর্ণে শুনিতে পাইয়াছিল তাহাদের আর বুঝিতে বাকী রহিলনা যে, ইনি একজন উঁচু দরের মুসলিম সাধু পুরুষ ছিলেন। তাহারা মস্তকটিকে সযত্নে হযরত শাহজালালের খেদমতে হাযীর করিল ও তাঁহার নিকট ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইল। তাহাদের দেখা-দেখি অন্যান্য জেলেরাও মুসলমান হইয়াছিল। হযরত শাহজালাল তাঁহার মস্তকহীন দেহ লুতের মাজার নামক স্থানে দাফন করিবার নির্দেশ দান করেন। কিন্তু তাঁহার ছিন্ন মস্তক দাফন করা হয় তিতাস নদীর তীরে। কারণ শহীদ হওয়ার পূর্বে হযরত শাহজালাল তাঁহাকে ধর্ম প্রচারের জন্য ত্রিপুরা রাজ্যে পাঠাইবার স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। শাহপীর 'কল্লাশহীদ' নামেও পরিচিত। তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তি ও কারামাতের বহু কাহিনী লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়। শাহপীরের মাযারের সংলগ্ন একটি মসজিদ ও মুসাফিরখানা আছে। প্রতি বৎসর ২৭শে শ্রাধণ হইতে ১লা ভাদ্র পর্যন্ত সেখানে উরুস অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তের দল দুর দূরান্তর হইতে আগমন করিয়া উরুসে যোগদান করে ও ভক্তিভরে তাঁহার মাযার যেয়ারত করিয়া চলিয়া যায়।

ফতেহ গাযী

ইনি পীরের এজাযত লইয়া সৈয়দ নাসিরউদ্দীনের সংগে তরফ বিজয়ে গমন করিয়াছিলেন। অলৌকিক আধ্যাত্মিক শক্তিতে তিনি খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সুদীর্ঘকাল আধ্যাত্মিক সাধনা ও ইসলাম প্রচারের কার্যে নিয়োজিত থাকিয়া তিনি মুসলিম জগতের প্রভুত কল্যাণ সাধন করেন। তাঁহার মাযার শাহাজী বাজার রেল ষ্টেশনের অনতিদুরে একটি সুন্দর দালানের ভিতর অবস্থিত। মাযারের সন্নিকটে আছে একটি মসজিদ। বহু লোক এই মসজিদে নামায পড়ে ও পীর ফতেহ গাযীর আধ্যাত্মিক প্রেরণা লাভের উদ্দেশ্যে যেকর, মোরাকাবা ও মোশাহাদায় লিপ্ত হয়। মোগল আমলে উক্ত দরগার ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য জায়গীরের ব্যবস্থা ছিল।

ফতেহ গাযী রঘুনন্দন পাহাড়ের যেস্থানে থাকিয়া সাধনা করিতেন সে জায়গা এখন ফতেহপুর বলিয়া পরিচিত। অদ্যাবধি সেখানে তাঁহার চিল্লাখানা দেখিতে পাওয়া যায়। কামেল ওলি ছিলেন বলিয়া জনসাধারণ, আমীর ওমরাহ সকলেই তাঁহার মাযার শরীফে গমন করে ও ভক্তিভরে যেয়ারত করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করে।

শাহ শরীফ

ইনি হযরত শাহজালালের আদেশে পিল্লাকান্দি নামক গ্রামে গিয়া সাধনায় লিপ্ত হন ও তথায় ইসলাম প্রচার কার্য চালাইতে থাকেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় বহু হিন্দু মুসলমান হয়। পিল্লাকান্দি ও উহার আশেপাশের লোকেরা এখনও ভক্তিভরে তাঁহার নাম উচ্চারণ করিয়া থাকে। পিল্লাকান্দিতেই তাঁহার শেষ সমাধি রচিত হয়। কিন্তু কুশিয়ারা নদীর ভাঙ্গনের ফলে তাঁর মাযার নদী-গর্ভে বিলীন হইয়া যায়। তাই ভক্ত জনসাধারণ তাঁহার মূল কবরের মাটি সংগ্রহ করিয়া নদীর তীরবর্তী আরেকস্থানে আনিয়া দাফন করিয়াছে। ভক্তবৃন্দ এখন সেইখানে আসিয়া তাঁহার মাযার যেয়ারত করে।

সৈয়দ রুকনুদ্দীন

ইনি হযরত শাহজালালের শিষ্যত্ব লাভ করিয়া তাঁর অনুচর রূপে শ্রীহট্টে আগমন করেন। কামালিয়াত হাসিল হওয়ার পর হযরত শাহজালাল তাঁহাকে ধর্মপ্রচারের নির্দেশ দান করেন, সেমতে সৈয়দ রুকনুদ্দীন সফরে বাহির হন এবং বহু লোককে ইসলামের আলোকে আলোকিত করিয়া অবশেষে কদমহাটা পৌঁছেন। কদমহাটার পূর্ব নাম ছিল 'কদম আট্কা'। 'কদম' আরবী শব্দ, উহার অর্থ পা। কথিত আছে, সৈয়দ রুকনুদ্দীন এই স্থানে পৌঁছিয়া পা আটকাইয়া তাঁহার সফর শেষ করিয়াছিলেন বলিয়া উহার নাম

হইয়াছিল কদম আট্‌কা। ইহাই ছিল তাঁহার সর্বশেষ প্রচারক্ষেত্র। ইহার পর আর তিনি অন্য কোথাও গমন করেন নাই। কদম হাটায় তিনি একটি ঈদগাহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি নিজে তথায় ইমামতি করিতেন বলিয়া সেখানে বহু লোকের সমাবেশ হইত। ঈদগাহের সাথেই তাঁহার মাযার শরীফ বিদ্যমান।

শাহকালা মুজার্‌‌রদ

শাহকালা ইয়ামনের অধিবাসী ছিলেন। জীবনে তিনি কখনও বিবাহ করেন নাই। ঘর-সংসার বলিতে তাঁহার কিছুই ছিল না। হরযত শাহজালালের আদেশে তিনি ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র হিসাবে ভাদার দেউল নামক স্থানে আস্তানা স্থাপন করেন এবং সুদীর্ঘ-কাল যাবৎ তাবলীগে দ্বীনের কাজে নিয়োজিত থাকিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ভাদার দেউলে তাঁহার মাযার আছে।

শাহ জিয়াউদ্দীন

শাহ জিয়াউদ্দীন ইয়ামন হইতে হযরত শাহজালালের সাথে শ্রীহট্টে আগমন করেন। হযরত শাহজালাল তাঁহাকে ইসলাম প্রচারের জন্য দেওরাইল পরগনার অন্তর্গত বোন্দাশীল গ্রামে প্রেরণ করেন। বোন্দাশীলের লোকগুলি যেমন কু-সংস্কারগ্রস্ত, তেমনি দুর্দান্ত প্রকৃতির ছিল। শাহ জিয়াউদ্দীন তাহাদিগকে একান্ত আপন-জনের মত মিষ্টি মধুর ভাষায় সুপথে আনিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় অনেক অমুসলিম ইসলামের আলোকে আলোকিত হয় ও বহু কু-সংস্কারগ্রস্ত মুসলমান ইসলামের সত্যিকার মাহাত্ম বুঝিতে পারিয়া সুপথে ফিরিয়া আসে। জীবনের শেষদিনটি পর্যন্ত তিনি এই কাজে লিপ্ত ছিলেন।

কথিত আছে—একবার দেওরাইল নামক এক দৈত্য বোন্দাশীল গ্রামে বেশ উপদ্রব শুরু করিয়া দেয়। জনগণ দরবেশ শাহ জিয়াউদ্দীনের স্মরণাপন্ন হইলে তিনি তদীয় পীর হযরত শাহজালালের

খেদমতে হাযীর হন ও সকল ঘটনা ব্যক্ত করিয়া এ ব্যাপারে তাঁহার সাহায্য কামনা করেন। শুনিয়া হযরত শাহজালাল নিজেই সেখানে গমন করেন। তাঁহাকে দেখামাত্রই দৈত্যের হৃদকম্প উপস্থিত হয় এবং জীবন লইয়া পলায়ন করে। —বোন্দাশীলেই শাহ জিয়াউদ্দীনের মাযার ছিল, কিন্তু নদীর ভাঙ্গনের ফলে উহা পানির অতলগর্ভে লীন হইয়া গিয়াছে।

হামিদ ফারুকী

ইসলাম প্রচারার্থে সর্বপ্রথম যে স্থানে তিনি আস্তানা স্থাপন করেন তাহার নাম মউরাপুর। মউরাপুরে তিনি সপরিবারে বাস করিতেন। ইহার পর তিনি কাউকাপন চলিয়া যান ও সেখানকার কু-সংস্কারগ্রস্ত লোকদের মধ্যে ইসলামের সু-মহান আদর্শ বাণী প্রচার করেন। দাদাপীর হযরত সৈয়দ আহমদ কর্তৃক প্রদত্ত মাটির ঘটনাটি তাঁহার মনে ছিল। তাই যেখানেই তিনি যাইতেন সেখান-কার মাটি পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন। ইহা একরূপ তাঁহার অভ্যাসে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। দরবেশ হামিদ ফারুকী কাউকাপনে গিয়া দেখিলেন, দাদাপীর কর্তৃক প্রদত্ত মাটির সহিত কাওকাপনের মাটির যথেষ্ট সামঞ্জস্য রহিয়াছে। তাই তিনি স্থির করিলেন, মউরাপুর পরিত্যাগ করিয়া কাউকাপনে বসতি স্থাপন করিবেন। জানিনা উহার মধ্যে কি রহস্য ছিল। দরবেশ হামিদ ফারুকী সত্যি সত্যিই একদিন সপরিবারে কাউকাপন চলিয়া আসিলেন ও তথায় স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে লাগিলেন। কাউকাপনেই তাঁহার শেষ সমাধি রচিত হয়। তিনি যে বাড়ীতে বসবাস করিতেন তাহা খোন্দকার বাড়ী নামে পরিচিত।

পীর গোরাচাঁদ

তাঁহার আসল নাম সৈয়দ আব্বাস, কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি পীর গোরাচাঁদ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি খুব

কামেল ওলী ছিলেন। হযরত শাহজালাল তাঁহাকে ইসলাম প্রচারের জন্য সুন্দরবন অঞ্চলে প্রেরণ করেন। তখন এই অঞ্চলের লোকগুলি ভারী দুর্দান্ত ছিল। পীর গোরাচাদের নসিহত বাণী তাহাদের কতিপয়ের অন্তরে আগুন জ্বালাইয়া দিল। কারণ, উহা ছিল তাহাদের স্বার্থের প্রতিকুলে। সুতরাং একদা নিশীতে কতিপয় দুর্দান্ত ব্যক্তি একত্রিত হইয়া অতর্কিতে তাঁহাকে আক্রমণ করতঃ শহীদ করিয়া ফেলিল। —চব্বিশ পরগনা জিলার বশিরহাট মহকুমায় হাড়োয়া গ্রামে তাঁহার মাযার আছে। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ মরহুম ডক্টর শহীদুল্লাহ পীর গোরাচাঁদের খাদেমের বংশধর। ডক্টর শহীদুল্লাহ ফুরফুরা শরীফের পীর হযরত মাওলানা আবুবকর সিদ্দীক (রহঃ)এর মুরীদ ছিলেন। তাঁ'র প্রণীত ইসলাম প্রসঙ্গ পুস্তকে ইহার উল্লেখ আছে। তিনি খেলাফতও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শাহ কামাল ও শাহ জামাল

ইঁহারা উভয়ে হযরত শাহজালালের শিষ্যত্ব অর্জন করিয়া কামেল ওলী হইয়াছিলেন। হযরত শাহজালাল তাঁহাদিগকে ইসলাম প্রচারের জন্য কোন জায়গা নির্দিষ্ট করিয়া দেন নাই। কথিত আছে—পীরের আদেশে তাঁহারা যখন তাবলীগে দ্বীনের কাজে সফরে বাহির হইবার সময় তাঁহার দোআ নিতে আসেন, তখন হযরত শাহজালাল বলেন, তোমাদের এই বাহন উষ্ট্রই তোমাদের প্রচারকেন্দ্র নির্দিষ্ট করিয়া দিবে। উষ্ট্র যেখানে গিয়া থামিবে, তাহাই হইবে তোমাদের প্রচারকেন্দ্র। যাও! আল্লাহর নামে বাহির হইয়া পড়। তিনিই তোমাদের উত্তম পথপ্রদর্শক।

পীরের দোআ লইয়া শাহ কামাল ও শাহ জামাল যাত্রা আরম্ভ করিলেন। কুমিল্লা হইতে সাত-আট মাইল দূরে একটি নির্দিষ্ট স্থানে যাওয়ার পর হঠাৎ তাহাদের উষ্ট্রটি দাঁড়াইয়া পড়িল। কোনমতেই আর উহাকে সামনে অগ্রসর করা গেল না। শাহ

কামাল ও শাহ জামাল বুঝিলেন, ইহাই তাঁহাদের কর্মস্থল। এখানেই তাহাদিগকে আস্তানা পাতিয়া কাজে নামিতে হইবে। পরামর্শ করিয়া তাহারা সেখানে অবতরণ করিলেন ও একটি উত্তম জায়গা দেখিয়া তথায় নিজেদের হুজরা নির্মাণ করিলেন। উট দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া পরবর্তীকালে সে গ্রামের নাম হয় 'উটখাড়া'। উটখাড়াতেই তাহাদের শেষ সমাধি রচিত হয়।

পীর জালালুদ্দীন

ইনি শাহজালাল নামেও পরিচিত ছিলেন। কামালিয়াত হাসিল হওয়ার পর হযরত শাহজালাল তাঁহাকে কুরুয়া পরগনার অন্তর্গত খুশ্‌কীপুর মৌজায় ইসলাম প্রচারের জন্য নিয়োজিত করেন। প্রবাদ আছে—খুশ্‌কীপুরে এক ব্রাহ্মণ বাস করিত। তাহার একটি রূপসী কন্যা ছিল। ব্রাহ্মণ পীর জালালুদ্দীনের আধ্যাত্মিক শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া একদিন তাঁহার খেদমতে হাযীর হয় ও সকল ঘটনা খুলিয়া বলে। সেমতে পীর জালালুদ্দীন কন্যাটির আরোগ্য কামনা করিয়া মুনাজাত করেন। খোদার মহিমা! ইহার পর কন্যাটির খঞ্জত্ব দূর হইয়া যায় ও সে পরিপূর্ণ সুস্থ মানুষে পরিণত হয়। ইহা দেখিয়া উক্ত ব্রাহ্মণ সপরিবারে তাঁহার নিকট হাযীর হইয়া ইসলামে আত্মসমর্পণ করে। শুধু তাহাই নয়, তাঁহার সহিত আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সে তাহার সেই খঞ্জ কন্যাকে তাহার সহিত বিবাহ দেয়।

খুশ্‌কীপুর মৌজায় পীর জালালুদ্দীনের মাযার আছে। সেখানকার অনেক পরিবার নিজেদেরে পীর জালালুদ্দীনের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে।

দাওর্ বখ্‌শ্ খতীব

তিনি আতুয়াজান পরগনার অন্তর্গত দাওরাই নামক গ্রামে বাস করিতেন। মা'রেফাত-সাধনায় যেরূপ তিনি কামালিয়াত হাসিল

করিয়াছিলেন, বাগ্মীতায়ও তাঁহার তদ্রূপ দক্ষতা ছিল এবং এই-জন্যই তিনি খতীব উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। কথিত আছে—একদা তিনি সমবেত জনতাকে ইসলামের মর্মকথা বুঝাইতেছিলেন। তাঁহার হৃদয়গ্রাহী ভাষা শুনিয়া জনৈকা হিন্দু রমণী তৎক্ষনাৎ ইসলাম ধর্ম কবুল করে ও তাঁহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব দেয়। দরবেশ দাওর বখ্‌শ্‌ তাহার সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন নাই। তাহাকেই তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন এবং জীবনের শেষদিনটি পর্যন্ত তাঁহার সহিত একত্রে থাকিয়া দাম্পত্যজীবন সুখে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। যে মৌজায় তিনি বাস করিতেন তাহা তাঁহারই নামানুসারে দাওরাই মৌজা নামে অভিহিত। দাওরাই মৌজার একটি টিলার উপর তাঁহার মাযার অবস্থিত। মাযারের সাথেই একটি ঈদগাহ আছে। উহা তিনি নিজেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং নিজেই সেখানে ইমামতী করিতেন।

কুতুবুল আওলিয়া

তাঁহার আসল নাম শাহ ইলিয়াস কুদ্দুছ। তরফ বিজেতা সৈয়দ নাসিরুদ্দীনের বংশে ঘড়গাঁও নামক গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হযরত শাহজালালের প্রত্যক্ষ শিষ্য ছিলেন না বটে কিন্তু পরোক্ষ শিষ্য ছিলেন। হযরত শাহজালাল (রহঃ) মা'রেফাতের যে অপূর্ব আলোক রশ্মি তাঁ'র সুযোগ্য শিষ্যবৃন্দের অন্তরে প্রদীপ্ত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, যুগ যুগ ধরিয়া তাহা বিদ্যমান ছিল। কালচক্র তাহা নির্বাপিত করিতে পারে নাই বা উহাতে এতটুকু ঘুণও ধরাইতে পারে নাই। সেই আলোক রশ্মিই প্রবেশ করিয়াছিল শাহ ইলিয়াস কুদ্দুছের অন্তরে দুইটি উপায়ে—

প্রথম বংশীয় রক্তধারা। তিনি সৈয়দবংশীয় ছিলেন। আর হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)এর পর হইতে এই বংশ ধর্মপরায়ণতার দিক দিয়া সর্বদাই অগ্রগামী ছিল এবং এখনও আছে। তদুপরি হযরত

শাহজালালের হাতে গড়া শিষ্য সৈয়দ নাসিরউদ্দীনের বংশানুক্রমিক ভাবে যে রক্ত ধারা তিনি লাভ করিয়াছিলেন তাহা স্বভাবতঃই তাঁহার অন্তরে ধর্মীয় অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু এতদিন তাহা সুপ্ত ছিল। হঠাৎ একটি ঘটনায় সেই সুপ্ত আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ঘটিল—

শাহ ইলিয়াস কুদ্দুছের পরিবারে একটি বাঁদী ছিল। একদিন কি এক কথা প্রসঙ্গে তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল—"দিনত চলিয়া গেল"। শাহ ইলিয়াছ কাছেই ছিলেন। কথাটি তাঁহার অন্তরে এমন ভাবে আঘাত করিল যে, সেই মুহূর্তেই তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন। "দিনত চলিয়া গেল" পৃথিবীতে কেন আসিলাম, আর কি করিয়া গেলাম! পুঁজিত কিছুই সঞ্চিত হয় নাই। খরচের খাতাই শুধু ভরিয়া রহিয়াছে, জমার খাতা যে শূন্য। শাহ ইলিয়াছ এক নির্জন জঙ্গলে গিয়া এবাদাতে মশগুল হইলেন।

আহার নাই, নিদ্রা নাই, শুধু সাধনা আর সাধনা। দিন রাত তিনি এবাদাতে ডুবিয়া রহিলেন। সুদীর্ঘকাল এই ভাবে এবাদাত করার পর আল্লাহ তাঁহার প্রতি সদয় হইলেন, তিনি কামালিয়াত হাসিল করিলেন।

কথিত আছে—একদা নিশীথে তিনি হুজরায় বসিয়া আল্লাহর ধ্যান করিতেছিলেন, ঘরে প্রদীপ প্রজ্বলিত ছিল না। এমন সময়ে উপর হইতে চন্দ্রালোকের ন্যায় একটি উজ্জ্বল আলোক রশ্মি তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিল এবং তাঁহাকে সহ সমুদয় গৃহাভ্যন্তর উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। এই অলৌকিক ঘটনা ঘটার পর তিনি কুতুবুল আওলিয়া বা ওলীদের মুকুটমনি উপাধিতে ভূষিত হন এবং ঐ গ্রাম চন্দ্রচুরি নামে পরিচিত হয়।

শাহ ইলিয়াছ সত্যিই দরবেশদের মুকুটমনি ছিলেন। মা'রেফাত সাধনায় তাঁহার সমসাময়িকগণ কামালিয়াতের এত উচ্চ শিখরে পৌঁছিতে পারেন নাই। তিনি যখন নামাযে দণ্ডায়মান হইতেন

তখন তাঁহার বাহজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে লোপ পাইত। "দিন ত চলিয়া গেল, পৃথিবীতে আসিয়া কি করিলাম!" কথাটি তাঁহার অন্তরে যে ঢেউ জাগাইয়াছিল, জীবনকাল পর্যন্ত তাহা আর তিনি ভুলিতে পারেন নাই। তিনি কথা বলিতেন অন্তরের ভাষা দিয়া। সে ভাষা ঘোর পাপীর মনেও দাগ কাটিত। তিনি যখন মোনাজাত করিতেন তখন তাঁহার বাহজ্ঞান থাকিত না। চক্ষু হইতে অনর্গল অশ্রুবন্যা ঝরিয়া পড়িত। মা-হারা কচি সন্তান মা-কে না পাইয়া যে ভাবে ক্রন্দন করে, মোনাজাতের সময় তিনিও তদ্রূপ ব্যাকুলিত চিত্তে ক্রন্দন করিতেন। তাঁহার সে ক্রন্দনে আল্লাহ্‌র আরশে কম্পন জাগিত, ফেরেশতারা নীরব নিস্তব্ধ হইয়া শুনিত, ভক্ত শিষ্যের দল কাঁদিয়া আকুল হইত।

পার্থিব সম্পদ বলিতে তাঁহার তিনখানা পাথর ছিল। উহার একখণ্ডে বসিয়া তিনি ওযু করিতেন, একখণ্ডের উপর দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেন ও অপর খণ্ডে আহার করিতেন। প্রস্তর খণ্ডত্রয় তাহার জন্মস্থান ঘড়গাঁও এ এখন পর্যন্ত সযত্নে রক্ষিত আছে। ঘড়গাঁওয়ের যে বাড়ীতে তিনি থাকিতেন অদ্যাবধি তাহা 'পীরের বাড়ী' বলিয়া পরিচিত।

কুতুবুল আউলিয়ার প্রপৌত্র গদা হাসানও একজন উঁচুদরের ওলী ছিলেন। সাধনা জগতে তাঁহারও খুব খ্যাতি ছিল। কথিত আছে—আরাকানের তৎকালীন মঘ রাজা তাঁহার পূর্বপুরুষ সৈয়দ মূছাকে যে তরবারীখানা উপহার দিয়াছিলেন এবং যাহা বংশানুক্রমিক ভাবে উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা এবং তদসাথে একটি অশ্ব সুবিখ্যাত যোদ্ধা শমসের গাযীকে দান করিয়া বলেন যে এই তরবারী ও অশ্ব তোমাকে দান করিলাম। উহার দৈবশক্তিতে তুমি সর্বদা জয়ী থাকিবে এবং শেষপর্যন্ত চাকলাবাদের শাসনক্ষমতা তোমার হাতে আসিবে। বলা বাহুল্য, তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইয়াছিল। শমসের গাযী চাকলাবাদের রাজা হইয়াছিলেন।

খোয়াই নদীর বামতীরে মুড়ারবন্দ দরগায় কুতুবুল আউলিয়া শাহ ইলিয়াস কুদ্দুসের মাযার অবস্থিত। যুগের পর যুগ চলিয়া গিয়াছে কিন্তু মানব মনের উপর হইতে তাঁহার ভক্তি-সিংহাসন এখনও উঠিয়া যায় নাই। এখনও দূর দূরান্ত হইতে লোকেরা তাঁহার মাযারে আসে ও ভক্তিভরে যেয়ারত করিয়া চলিয়া যায়। আল্লাহ তাঁহার খাঁটি বান্দাদিগকে এ ভাবেই চিরঞ্জীব করিয়া রাখেন।

হযরত শাহজালালের প্রত্যক্ষ শিষ্যের সংখ্যা অনেক। পরোক্ষ শিষ্যের সংখ্যা তা'র চাইতেও বেশী। "সিলেট শহর তিনশত ষাট আউলিয়ার মুল্লুক" বলিয়া যে প্রবাদ প্রচলিত আছে তাহা তাঁহার হাতে গড়া কামালিয়াত প্রাপ্ত শিষ্যদের সংখ্যা। এইসব শিষ্যকে তিনি ইসলাম প্রচারের কাজে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। ইহাদের প্রত্যেকেই এক একটি উজ্জ্বল রত্ন ছিল। এতদ্ব্যতীত তাঁহার আরও শিষ্য ছিল যাহারা হয়তঃ হেদায়াতপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু কামালিয়াতের সোপান পর্যন্ত পৌঁছিতে পারেন নাই কিংবা হযরত শাহজালাল তাহাদিগকে কাজের ভার দান করেন নাই বলিয়া জন সমাজে তাহারা খ্যাতিলাভ করিতে পারেন নাই। —যাহা হউক, এবার আমরা পাঠকবৃন্দের খেদমতে হযরত শাহজালালের সংগীদের নামের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা পেশ করিব—আল্লাহ তাওফীক দান করুন—।

হযরত শাহজালালের শিষ্যবৃন্দের নাম

নাম	নাম
১ সিকান্দর খান গাযী	৫ হাজী খলিল
২ সৈয়দ নাসিরউদ্দীন	৬ হাজী দরিয়া
৩ শাহজাদা আলী	৭ হাজী ইউসুফ
৪ খাজা আদিনা	৮ শেখ খেজের খান দবীর

নাম	নাম
৯ মানিক পীর	৩৪ আলী খাজা (২)
১০ ছোট পীর	৩৫ ইকবাল খাজা
১১ শাহ চট	৩৬ আবুল খায়ের
১২ আমানউল্লাহ শেখ	৩৭ আযীয চিশতী খাজা
১৩ আবদুল মালিক	৩৮ আবদুর্ রহীম
১৪ আহমদ শেখ	৩৯ এখতিয়ার খাজা
১৫ আবুল ফজল শেখ	৪০ আস্‌লি ইয়ামনি
১৬ আলী ইয়ামনি	৪১ আমীরউদ্দীন খাজা
১৭ আহমদ হাজী (১)	৪২ আবু সাঈদ
১৮ আহমদ হাজী (২)	৪৩ আবুল আব্বাস সৈয়দ
১৯ আলম সৈয়দ	৪৪ আবদুল জলীল সৈয়দ
২০ আদম খাকী	৪৫ আবদুল হেকীম
২১ আবদুল্লাহ	৪৬ আহমদ নিশান বরদার
২২ আহমদ কবীর সৈয়দ	৪৭ আতাউল্লা হাফীয
২৩ আযীয সৈয়দ	৪৮ আমীর সৈয়দ
২৪ আহমদ সৈয়দ	৪৯ আরীফ মুলতানী
২৫ আজিয়াল সৈয়দ	৫০ ইমামুদ্দীন
২৬ আবদুশ্‌ শুকুর	৫১ মুহিব আলী
২৭ আবুল হাসান	৫২ খলিল দেওয়ান
২৮ আযীয আস্করী	৫৩ ফক্‌রুদ্দীন সৈয়দ
২৯ আবুল আরীজ	৫৪ দৌলত শহীদ
৩০ আবুবকর সৈয়দ (১)	৫৫ খাজা বুরহানুদ্দীন কাত্তাল
৩১ আবুবকর সৈয়দ (২)	৫৬ হোসেন শহীদ
৩২ আদ খাজা	৫৭ ইসা চিশতী খাজা
৩৩ আলী খাজা (১)	৫৮ হুজ্জাত মালিক

নাম	নাম
৫৯ কাসিম সৈয়দ হক্কানী	৮৪ গরীব শেখ
৬০ দৌলত সৈয়দ	৮৫ করিমদাদ রুমী
৬১ কুতুব আলম শেখ	৮৬ কবীর সৈয়দ
৬২ জাহাঙ্গীর সৈয়দ	৮৭ কালা মিয়া
৬৩ ফকরুদ্দীন কাযী	৮৮ গনি মাহমুদ
৬৪ জামিল সৈয়দ	৮৯ ফিরোয আতাই
৬৫ হাসান সুফী	৯০ গাযী হাজী
৬৬ ফয়েযউদ্দীন শেখ	৯১ দৌলত হাজী
৬৭ খিযির শেখ	৯২ হামযা সৈয়দ
৬৮ গায়েবী পীর	৯৩ জওহর সৈয়দ
৬৯ বদর সৈয়দ	৯৪ দৌলত মুনিরী
৭০ বুরহানুদ্দীন বোরহানা	৯৫ ফিরোয কাযী
৭১ বাহাউদ্দীন শেখ	৯৬ বদর মালিক
৭২ ফতেহ গাজী	৯৭ বদরুদ্দীন সৈয়দ
৭৩ গরীব খাকী	৯৮ হোসেন শেখ
৭৪ ইলিয়াছ শেখ	৯৯ জমশের হাজী
৭৫ জুনায়েদ গুজরাটি	১০০ কালু শেখ
৭৬ ইসা সৈয়দ (১)	১০১ বাজ শেখ
৭৭ ই া সৈয়দ (২)	১০২ আবদুল্লাহ শেখ
৭৮ ঈসা শেখ	১০৩ খিযির হাজী
৭৯ হুসামুদ্দীন বেহারী	১০৪ কাসিম হাজী
৮০ বাহার আস্কারী	১০৫ গাজী মালেক
৮১ ফরিদ সৈয়দ	১০৬ হাফিয মাহমুদ
৮২ দাউদ কোরায়শী	১০৭ জগাই শেখ
৮৩ বায়াযীদ সৈয়দ	১০৮ ফসীহ হাফিজ

নাম

১০৯ আহমদ সৈয়দ
১১০ আবদুল আযীয শেখ
১১১ হাবিব হাজী
১১২ হাশিম চিশতী
১১৩ বাহাউদ্দীন শেখ
১১৪ বুযুর্গ সৈয়দ
১১৫ আযীয সৈয়দ
১১৬ খিযির হাজী
১১৭ হুসামুদ্দীন
১১৮ হায়রাতউল্লা খতীব
১১৯ আবু সৈয়দ
১২০ বদরুদ্দীন সৈয়দ
১২১ দাউদ খাজা
১২২ খাজা মালিক
১২৩ খলিল সৈয়দ
১২৪ কামাল ইয়ামনি
১২৫ জালালুদ্দীন
১২৬ ফয়েজুল্লাহ কাযী
১২৭ দিলওয়ার খতীব
১২৮ আবু দৌলত
১২৯ আলাউদ্দীন শেখ
১৩০ দাওর বখ্‌শ খতীব
১৩১ আবদুল করীম শেখ
১৩২ দৌলত গাযী
১৩৩ জামাল শেখ

নাম

১৩৪ কাসিম সৈয়দ পীর
১৩৫ খাজা ওমর জাহান শেখ
১৩৬ হেলিমুদ্দীন শেখ
১৩৭ কুতুবউদ্দীন শেখ
১৩৮ হযরত খাজা বারমক
১৩৯ জাহান কাযী
১৪০ জামালুদ্দীন
১৪১ করিমউদ্দীন মাওলানা
১৪২ ইমাম শুকুরউল্লাহ
১৪৩ খলীলুল্লাহ সৈয়দ
১৪৪ ইসমাঈল উমারী
১৪৫ কুতুবউদ্দীন সৈয়দ
১৪৬ ফরিদ শেখ রওশন চেরাগ
১৪৭ ফরিদ আনসারী শেখ
১৪৮ আবদুল মুয়ালী সৈয়দ
১৪৯ জালালুদ্দীন সৈয়দ
১৫০ আবদুল মুয়ালী শেখ
১৫১ আবদুল করীম সৈয়দ
১৫২ নাসিরউদ্দীন খাজা
১৫৩ সিরাজুদ্দীন শেখ
১৫৪ মুহাম্মদ হাজী
১৫৫ জিয়াউল্লাহ শেখ
১৫৬ মুহাম্মদ ইয়াসীন
১৫৭ মুহাম্মদ জাকারিয়া হাজী
১৫৮ সালেহ মালেক

	নাম
১৫৯	পীর মালেক
১৬০	মুহাম্মদ আনসারী শেখ
১৬১	পর্বত জাহান পীর
১৬২	ওমর চিশতী হাজী
১৬৩	নসর সৈয়দউল্লাহ
১৬৪	রুকনুদ্দীন পীর
১৬৫	শরীফ হাজী
১৬৬	ওমর কাযী
১৬৭	মখদুম নিযামুদ্দীন ওসমানী
১৬৮	লতীফ হাজী
১৬৯	ওমর জাহান খাজা
১৭০	শাহ তাজুদ্দীন সৈয়দ
১৭১	শাহ জিয়াউদ্দিন
১৭২	মুহম্মদ রওশন সৈয়দ
১৭৩	ওমর চিশতী খাজা
১৭৪	ওসমান দাওরী হাজী
১৭৫	নিয়ামত উল্লাহ শেখ
১৭৬	জিয়াউদ্দীন সৈয়দ
১৭৭	সিকান্দর তাবলবাজ
১৭৮	মুহাম্মদ জোনায়েদ
১৭৯	সলিম খাজা
১৮০	সিরাজ খাজা
১৮১	সুনা গাযী
১৮২	সুলতান শাহ
১৮৩	মুহাম্মদ শাহবাজ

	নাম
১৮৪	নিযামুদ্দীন বাগদাদী
১৮৫	পীর সৈয়দ কাসিম
১৮৬	সদর শেখ
১৮৭	মুখতার শহীদ
১৮৮	সলিম শেখ
১৮৯	জাকারিয়া আরবী
১৯০	মুহাম্মদ সুজা
১৯১	শরীফ আজমিরী
১৯২	পিয়ার খাজা
১৯৩	মখদুম রহীমুদ্দীন
১৯৪	সিকান্দর শেখ
১৯৫	নিযামুদ্দীন কেরমানী
১৯৬	শেখ নসরত
১৯৭	শেখ শমন
১৯৮	জৈনদ্দিন আব্বাসী
১৯৯	জৈনদ্দিন জাকারিয়া
২০০	ওসমানউদ্দীন
২০১	ওমর শেখ
২০২	জৈব হাজী
২০৩	নূর মালিক
২০৪	মাসুদ মালিক
২০৫	জাকি শেখ
২০৬	মুহম্মদ লতীফ
২০৭	মুস্তফা সৈয়দ
২০৮	রুকনুদ্দীন আনসারী

	নাম
২০৯	জাকারিয়া হাফিজ
২১০	শাহবাজ আনসারী
২১১	মখতুম হবীব
২১২	মুহম্মদ জাহান সৈয়দ
২১৩	ওমর সমরকন্দি সৈয়দ
২১৪	মুলিম সৈয়দ
২১৫	সৈয়ফ উদ্দীন সৈয়দ
২১৬	মা'রূফ সিলাহদার
২১৭	তাজউদ্দীন কাযী
২১৮	মুহাম্মদ আশিক
২১৯	মালিক মুহাম্মদ
২২০	মওতুদ সৈয়দ
২২১	নূরুল হুদা
২২২	মখতুম জা'ফর গজনবী
২২৩	মুজঃফর বিহারী
২২৪	মুহাম্মদ তকী
২২৫	মুহাম্মদ নকী
২২৬	মুহাম্মদ আইউব ইমাম
২২৭	সুনাশেখ
২২৮	মুহাম্মদ আমীন
২২৯	মুহাম্মদ সালেহ
২৩০	তাজ মালিক

	নাম
২৩১	ওসনাম শেখ
২৩২	শাহ দেওয়ান গাযী
২৩৩	ওজীহ উদ্দীন
২৩৪	মুহাম্মদ সৈয়দ
২৩৫	শরফ্‌দ্দীন শেখ
২৩৬	মূসা শেখ
২৩৭	কামালুদ্দিন
২৩৮	নূরুল্লাহ
২৩৯	তাহির শেখ
২৪০	মুহাম্মদ গজনবী সৈয়দ
২৪১	সাধু শেখ
২৪২	ওমর দরিয়াই
২৪৩	মুহাম্মদ দানা শেখ
২৪৪	মুহাম্মদ নূর সৈয়দ
২৪৫	মুহাম্মদ সৈয়দ
২৪৬	তৈয়ব সালেমী
২৪৭	মুহিমুদ্দীন শেখ
২৪৮	সুফিয়ানা খাজা
২৪৯	মুহাম্মদ কিবারী শেখ
২৫০	সিকান্দর শেখ
২৫১	শাহাবুদ্দীন

এইসব বোযর্গের সকলেই ওলীয়ে কামেল ছিলেন। ইহাদেরই সাহায্যে হযরত শাহজালাল (রহঃ) গোটা বাংলাদেশে ইসলামের আলোকরশ্মি প্রদীপ্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইহারা তাঁহার হাতে গড়া শিষ্য। ইহাদেরও শিষ্য ছিল এবং তাঁহারাও সকল আত্মসুখ বিসর্জন দিয়া ইসলাম প্রচারের কাজে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। বাংলাদেশ আজ যে নিজেকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ বলিয়া দাবী করে তাহার পিছনে এইসব ওলী আল্লাহ্র অবদান রহিয়াছে। আল্লাহ তাঁহাদের সবাকেই শান্তিদান করুন!

কারামাতুল আউলিয়া

নবুওতের যুগে আল্লাহ পাক সাধারণ মানুষের কাছে নবীদের সত্যতা প্রমাণ কল্পে তাঁহাদিগকে বিশেষ বিশেষ মা'জেযা বা অলৌকিকত্ব দান করিয়াছিলেন। মানুষেরা যখন তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিতে চাহিত না কিংবা আধা বিশ্বাস ও আধা অবিশ্বাসের মধ্যে হাবুডুবু খাইত, তখন নবীগণ আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি বলে এক এক প্রকার অলৌকিকত্ব প্রদর্শন করিতেন। উহা দেখিয়া যাহাদের অন্তর বিশ্বাসের যোগ্য, তাহাদিগকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিত, আর যাহাদের অন্তর পাপের কালিমায় পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছিল তাহারা অবিশ্বাসের মধ্যেই থাকিয়া যাইত।

হযরত মূসা (আঃ) নয় প্রকার মা'জেযার অধিকারী ছিলেন। তন্মধ্যে হাতের লাঠি বিরাট অজগরে পরিণত হওয়া ও বগলে হাত রাখিলে তাহা চন্দ্রলোকের ন্যায় উজ্জ্বল দৃষ্ট হওয়া অন্যতম মা'জেযা ছিল। ফেরাউনের আদেশে যাদুকরগণ তাঁহার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে আসিয়া এই মা'জেযা দেখিয়া হতবাক্। অন্তরে পাপের কালিমা থাকিলেও উহা বিশ্বাস স্থাপনের একেবারে অযোগ্য হইয়া যায় নাই, তাই যাহারা নতি স্বীকারপূর্বক হযরত মুসার কথায় বিশ্বাস

করিয়া আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনিয়াছিল, কিন্তু দাম্ভিক ফেরাউন ও তাহার দলবল অবিশ্বাসের মধ্যেই রহিয়াছিল, কারণ পাপ-কালিমা তাহাদের অন্তর সমূহকে প্রস্তরবৎ কঠিন করিয়া রাখিয়াছিল।

হযরত ইছা (আঃ) আল্লাহ্‌র আদেশে মৃতকে জীবিত করিতে পারিতেন। তাঁহার হাতের পরশে কুষ্ঠরোগের মত দুরারোগ্য কঠিন ব্যাধিও নিরাময় হইত। আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হাতের ইশারায় চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া দেখাইয়াছিলেন। এসবই মা'জেযা। নবী রসূলগণ আল্লাহ্‌র আদেশেই এবম্বিধ মা'জেযা দেখাইতে পারিতেন। বর্তমানে নবুয়তের যুগ আর নাই। তাই মা'জেযারও অবসান ঘটিয়াছে। এখন আছে কারামাত—যা' আল্লাহ্‌র ওলী-গণ কর্তৃক সময় সময় প্রদর্শিত হইয়া থাকে। প্রসঙ্গতঃ বলা আবশ্যক মনে করি—সকল প্রকার অলৌকিকত্ব মা'জেযা বা কারামাত নয়। অর্থাৎ যে কোন লোক অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করিলে উহাকে মা'জেযা কিংবা কারামাত বলা চলিবে না এবং উহার কারণে ঐ ব্যক্তিকে বোযর্গ বলিয়াও ধারণা করা সঙ্গত হইবে না। কারণ, ফাসেক্, বেদ্বীন লোকের দ্বারাও অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হইতে পারে। অলৌকিকত্বের দ্বারা বোযর্গী প্রমাণিত হইবে তখন যদি ঐ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নির্দেশিত জীবন ব্যবস্থা মোতাবেক নিজ জীবন গড়িয়া থাকে এবং প্রতিটি কাজে ও কথায় আল্লাহ্‌র হুকুম মানিয়া চলে। এইজন্য ওলামায়েদ্বীন অলৌকিকত্বকে তিন ভাগে ভাগ করিয়াছেন। (১) মা'জেযা (২) কারামাত ও (৩) এস্তেদরাজ। নবী ও রসূলগণ কর্তৃক প্রকাশিত অলৌকিক ঘটনাকে মা'জেযা ও আল্লাহ্‌র ওলীগণ কর্তৃক প্রকাশিত অলৌকিক ঘটনাকে কারামাত বলা হয়। মা'জেযা ও কারামাত যথাক্রমে নবী-রসূল ও ওলীদের বিশেষত্ব। অবিশ্বাসী জনগণের মনে নবুওত ও বেলায়েতের প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র পথে ফিরাইয়া আনিবার জন্যই তাঁহাদিগকে এই বিশেষত্ব দান করা হইয়াছে। পার্থিব স্বার্থে বা

সম্মান লাভের উদ্দেশ্যে উহা প্রদর্শনের অনুমতি তাঁহাদের নাই। পক্ষান্তরে ফাসেক বেদ্বীন লোকদের দ্বারা যদি কোন অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পায় তবে উহাকে এস্তেদরাজ বলা হইবে এবং উহার কারণে ঐ ব্যক্তিকে বোযর্গ মনে করিয়া তাহার কথা মানিয়া চলা যাইবে না। কারণ উহা শয়তান কর্তৃক উদ্ভাবিত; সরলপ্রাণ মানুষকে বিভ্রান্তির জালে আট্‌কাইয়া কু-পথগামী করার জন্যই উহার উৎপত্তি। এইজন্য যাহারা সত্যিকার ওলীআল্লাহ তাহারা সর্বদাই সাধারণ মানুষকে এই বলিয়া হুঁশিয়ার করিয়া দেন যে, ব্যক্তি-চরিত্র না জানিয়া শুধু অলৌকিকত্বে মুগ্ধ হইয়া কাহরও কাছে যেন দীক্ষা গ্রহণ করা না হয়। কারণ উহার ফলে সুপথগামী হওয়ার পরিবর্তে কুপথগামী হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী থাকে। মানুষরূপী ভণ্ড শয়তান সরলপ্রাণ মানুষকে ধোকা দিয়া স্বার্থ আদায় করে।

হযরত শাহজালাল কামেল ওলী ছিলেন। তাঁহার কামালিয়াত অলৌকিকত্বের জন্য নয় বরং আধ্যাত্মিক সাধনা বলেই তিনি কামালিয়াত হাসিল করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। নিম্নে তাঁহার কামালিয়াত ও কারামাতের (অলৌকিকত্ব) কতিপয় ঘটনা উল্লেখ করা হইল ঃ—

(১) শ্রীহট্ট আগমনের পর হযরত শাহজালাল (রহঃ) যে জায়গায় আস্তানা স্থাপন করিয়াছিলেন সেখানে পানির কোন ব্যবস্থা ছিল না। অথচ ওযু গোসলের নিমিত্ত সব সময় পানির দরকার। তাই হযরত শাহজালাল নিজ ভক্তবৃন্দের সহায়তায় সেখানে একটি কূপ খনন করিয়াছিলেন। দরগার টিলার পশ্চিমে সামান্য দূরে যে কূপটি বর্তমানে দর্শকবৃন্দের নজরে পড়ে উহাই সেই বিখ্যাত কূপ। সিলেটের জনসাধারণ এই কূপটিকে মক্কা মোয়াজ্জমার জমজম কূপের সমান শ্রদ্ধা করিয়া থাকে।

কথিত আছে—কূপটি যখন খনন করা হয় তখন উহা অগভীর ছিল। ফলে উহাতে পানি জমিত না। অতঃপর হযরত শাহজালাল উহার মধ্যে স্বীয় যষ্টি স্থাপন করেন। যষ্টির পরশে কূপের তলদেশ

হইতে উচ্ছ্বসিত বেগে সলিল ধারা উত্থিত হইতে থাকে। বর্তমানে এই কূপের অবস্থা এই যে, উহার পানি কখনও কমে না, বৃদ্ধিও পায় না। বৃষ্টির পানিতে কূপ ভরিয়া গেলেও অল্পক্ষণ পরেই আবার উহা পূর্বের আকার ধারণ করে।

বহুদিন পূর্বের একটি ঘটনা—মনসুর আহমদ ও আবদুল ওহাব নামে দুইজন ধর্মপরায়ণ লোক সিলেটের চান্দাইটিলা গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহারা পরস্পরের বন্ধু ছিলেন। হজব্রত পালনোদ্দেশ্যে তাঁহারা মক্কা মোয়াজ্জমায় গমন করিয়াছিলেন। হজ্জক্রিয়া শেষ করিয়া তাঁহারা স্থির করিলেন, দেশে প্রত্যাবর্তনের পথে তাঁহারা বিভিন্ন দেশ সফর করিবেন। কিন্তু একটি অসুবিধা দেখা দিল—আবদুল ওহাবের সাথে কয়েকটি আশরাফী (স্বর্ণমুদ্রা) ছিল। উহার কি ব্যবস্থা করা যায়! সঙ্গে লইয়া পথ চলা সহজ নয়। বর্তমান কালের মত তখন চোর ডাকাতের অভাব ছিল না। রাহাজানি দস্যুবৃত্তি তখনও হইত, এখনও হয়। দস্যুরা টাকা পয়সা ত লুট করিবেই, সেই সাথে প্রাণটিও শেষ করিয়া যাইবে। হঠাৎ আবদুল ওহাবের একটি কথা মনে পড়িয়া গেল—কিংবদন্তী অনুসারে তিনি শুনিয়াছিলেন যে, জমজম কূপের সহিত হযরত শাহজালালের কূপের সংযোগ আছে। বলা বাহুল্য, কথাটা এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে, সরল প্রাণ আবদুল ওহাব, তথা—সাধারণ লোকের অন্তরে উহা একরূপ বিশ্বাসের আকার ধারণ করিয়া রহিয়াছিল। আবদুল ওহাব ভাবিলেন, তাইত, যদি আমি আশরাফী কয়টি একটি কাঠের বাক্সে পুরিয়া জমজম কূপে ফেলিয়া দেই তাহা হইলে হয়তঃ হযরত শাহজালালের মাহাত্মে উহা তাঁহার সিলেটস্থ কুয়ায় গিয়া পৌঁছিতেও পারে। বিশ্বাসে জোর ছিল, তিনি আশরাফী কয়টি একটি কাঠের বাক্সে পুরিয়া উহার গায়ে নিজের নাম লিখিয়া জমজম কূপে নিক্ষেপ করিলেন।

ইহার পর আবদুল ওহাব ও মনসুর আহমদ ইরাক, ইয়ামন, সিরিয়া, বাগদাদ প্রভৃতি দেশে সফর করিয়া যখন দেশে ফিরিয়া আসিলেন তখন বহুদিন অতীত হইয়া গিয়াছে। কারণ, এখনকার মত ওসময় দ্রুত চলাচলের জন্য কোন যানবাহন ছিল না। পায়ে হাটিয়াই সফর করিতে হইত। দেশে ফিরিয়া আবদুল ওহাবের আশরাফী কয়টির কথা মনে পড়িল। তিনি দরগার খাদেমের নিকট গমন করিলেন। —দরগার খাদেম খায়রুদ্দীন হযরত শাহজালালের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। একদিন অযূর পানি উঠাইতে গিয়া তিনি দেখিলেন, একটি কাঠের ছোট বাক্স ভাসিতেছে। বাক্সটিকে তুলিয়া দেখিলেন, উহার গায়ে 'আবদুল ওহাব' নামটি লেখা রহিয়াছে। বাক্সটি ভারী মনে হওয়ায় তিনি উহা সযত্নে রাখিয়া দিলেন। ভাবিলেন, হয়তঃ বা এই নামের কোন লোক কুয়া হইতে পানি তুলিতে গিয়া তাহার অজ্ঞাতসারে হঠাৎ বাক্সটি কুয়ায় পড়িয়া গিয়াছে। যথাসময়ে বাক্সটি না পাইলে সে উহা খোঁজ করিতে আসিবে।

অতঃপর আবদুল ওহাব যখন তাহার নিকট বাক্সটির কথা জানিতে চাহিলেন তখন খায়রুদ্দীন তাঁহাকে উহার বিবরণ দিতে বলিলেন। আবদুল ওহাব সবিস্তারে সব কথা খুলিয়া বলিলেন। খায়রুদ্দীন দেখিলেন, তাহার সব কথা মিলিয়া যাইতেছে। কয়টি আশরাফী তাহাও আবদুল ওহাব ঠিক মত বলিয়া দেওয়ায় তাহার বিশ্বাস হইল যে, আবদুল ওহাবই ইহার প্রকৃত মালিক। তিনি বাক্সটি ও আশরফীগুলি তাহাকে ফিরাইয়া দিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! কোথায় মক্কা মোয়াজ্জমা আর কোথায় সিলেট! এতদূরে এ বাক্স আসিল কি করিয়া! উভয়ে বুঝিলেন, ইহা হযরত শাহজালালের কামালিয়াতের বলেই সম্ভব হইয়াছে, বিশ্বাস তাহাদের পূর্ব হইতেই ছিল, এবার তাহা অধিকতর দৃঢ় হইল। আবদুল ওহাব আশরাফীগুলি আর বাড়ী ফিরাইয়া নিলেন না। যে মহান ওলী আল্লাহ্‌র কামালিয়াত ও বোযর্গীর বলে এইরূপ অসম্ভব কার্য সম্ভব হইয়াছে

তাঁহার পবিত্র আত্মার প্রতি সওয়াব রেছানীর উদ্দেশ্যে সেইখানেই তিনি উহা গরীব দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন।

(২) আদিকাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিশেষ বিশেষ পর্ব উপলক্ষে হযরত শাহজালালের দরগায় বহু লোকের সমাগম হইয়া আসিতেছে। ভক্তের দল চতুর্দিক হইতে ছুটিয়া আসে। মাযার যেয়ারত করে, কোরআন তেলাওয়াত, যেকর আযকার ইত্যাদি করিয়া শ্রদ্ধেয় পীরের আত্মার উদ্দেশ্যে ছওয়াব রেছানী করতঃ চলিয়া যায়। ভক্তপ্রাণ এই জনসাধারণকে দরগা হইতে খাবার দেওয়া হয়। সে এক এলাহী কাণ্ড! কোথা হইতে কিভাবে যে এত চাউল, গোশত সংগৃহীত হয় তাহা ভাবিলেও আশ্চর্য হইতে হয়। আল্লাহ্র ওলীর কারামাত ছাড়া ইহাকে আর কিছু বলা যায় না।

দরগার লঙ্গরখানার পূর্বদিকে অন্য একটি ঘরে বিরাটাকার দুইটি ডেকচি রহিয়াছে। ডেক্‌চির গায়ে লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে ১১০৬ হিজরী সনে জাহাঙ্গীর নগর (ঢাকা) নিবাসী আবুসাইদ নামক জনৈক ধনাঢ্য ধর্মপ্রাণ মুসলমান উহা তৈয়ার করাইয়াছিলেন এবং মীর মোরাদ বখশ নামক অপর এক ব্যক্তি উহা সিলেটে হযরত শাহজালালের দরগায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই বিরাটাকার ভারী ডেকচি দুইটি ঢাকা হইতে সিলেট প্রেরণ সম্বন্ধেও সিলেটের জন সাধারণের মধ্যে অনেক অলৌকিক কাহিনী শুনা যায়—

কথিত আছে—ডেকচি দুইটি নির্মিত হওয়ার পর উহা হযরত শাহজালালের দরগা পর্যন্ত পৌঁছানো এক অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। এত ভারী জিনিস বহন করিয়া নিয়া আসার মত কোন যান-বাহন তখন ছিল না। অবশেষে মোরাদ বখশ ভাবিলেন. যে ওলীর দরগার উদ্দেশ্যে উহা নির্মিত হইয়াছে তাঁ'র যদি কোন মাহাত্ম থাকে তবে আল্লাহ্র হুকুমে আপনা হইতেই উহা তাঁহার দরগায় গিয়া পৌঁছিবে। তাই তিনি লোক লাগাইয়া ডেকচি দুইটিকে বুড়িগঙ্গা

নদীতে ভাসাইয়া দিলেন। খোদার মহিমা! ডেকচি দুইটি ভাসিতে ভাসিতে সিলেটের চাঁদনী ঘাটে আসিয়া লাগিল। খবর পাইয়া আশেপাশের বহু লোক ডেকচি দুইটি দেখিতে আসিল। নাম ধাম সব কিছুই ডেকচির গায়ে লেখা ছিল। সুতরাং কোথায় কাহার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হইয়াছে তাহা বুঝিতে কাহারও কষ্ট হইল না। জনতা ডেকচি দুইটিকে তীরে টানিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে উহা ধরিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু কি আশ্চর্য! যেই মাত্র তাহারা উহার নিকটে গেল অমনি ডেকচি দুইটি দূরে সরিয়া গেল, কয়েকবার এইরূপ হওয়ার পর তাহারা বুঝিল, ইহা কারামাতী ডেকচি। যে সে লোকের হাতে উহা ধরা দিবে না। কাজেই তাহারা দরগার প্রধান খাদেম মৌলবী আবদুল আয়াস মুহাম্মদ আহাম্মদকে সংবাদ দিল। মৌলবী সাহেব আসিলেন। তাঁহার আসার সঙ্গে সঙ্গেই ডেকচি দুইটি তীর সংলগ্ন হইল। তিনি উহাদের টানিয়া তুলিলেন। ডেকচির গায়ে ফারসী ভাষায় নিম্নোক্ত কথা কয়টি লেখা ছিল—

"হিজরী ১১০৬ সালের ১২ই রমযান জাহাঙ্গীর নগরের অধিবাসী ইয়ার মুহাম্মদের পুত্র মুহাম্মদ জা'ফর তদীয় পুত্র আবু সাঈদ কর্তৃক নির্মিত হইয়া মোরাদ বখ্‌শ্‌ কর্তৃক অত্র ডেকচি হযরত শাহজালালের দরগায় প্রেরিত হইল। এই ডেকচি যেন কখনও দরগার বাহিরে নেওয়া না হয়। ইহার ওযন পাঁচমণ তিনসের দুই পোয়া মাত্র।"

ডেকচি দুইটি হযরত শাহজালালের দরগায় এখনও বিদ্যমান আছে। উহার প্রত্যেকটিতে সাতটি গরুর গোশত ও সাতমণ চাউল একসাথে পাক করা যায়। বিশেষ বিশেষ পর্বোপলক্ষে জন সমাগম বেশী হইলে এই ডেকচি ব্যবহার করা হয়। অন্যথা উহা নির্দিষ্ট গৃহে রক্ষিত থাকে। বাহিরের কোনও কাজে ব্যবহার করা হয় না।

(৩) হযরত শাহজালাল তাঁহার প্রিয় শিষ্য জিয়াউদ্দীনকে ধর্মপ্রচার কার্যে বোন্দাশীলে নিয়োজিত করিয়াছিল। বোন্দাশীলের

জন সাধারণকে সুরমা ও বরাক নদীর পানির উপর নির্ভর করিতে হইত। কিন্তু উহা এত বিস্বাদ ছিল যে, উহাদ্বারা রান্না বান্না করা বা পান করা একেবারেই অসম্ভব ছিল, যা'র ফলে স্থানীয় জন সাধারণ দারুণ কষ্ট ভোগ করিত। বোন্দাশীলের জনগণ দরবেশ জিয়াউদ্দীনকে এই বিষয় অবহিত করিলে তিনি তদীয় পীর হযরত শাহজালালের খেদমতে হাযীর হইয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন। 'হযরত শাহজালাল খলীফা জিয়াউদ্দীনের সাথে বোন্দাশীলে গমন করিলেন।

বোন্দশীলের অধিবাসীরা খুশী হইল। অবস্থা কি হয় তাহা দেখিবার জন্য তাহারা দলে দলে জিয়াউদ্দীনের আস্তানার ভিড় করিল। হযরত শাহজালাল (রহঃ) তাহাদিগকে বলিলেন—তোমরা আল্লাহ্‌র পথে আস, তাঁহার দ্বীনকে মজবুত করিয়া ধর। যাহারা আল্লাহতাআলাকে নিজেদের মাবুদে বরহক্ রূপে গ্রহণ করে আল্লাহ পাক তাহাদের প্রতি সদয় হন। তাহাদের অভাব অভিযোগ দূর করিয়া দেন। পক্ষান্তরে যাহারা আল্লাহ্‌র দ্বীনকে পরিত্যাগ করিয়া শয়তানের অনুগামী হয় আল্লাহ পাক তাহাদিগকে শয়তানের হাতেই সোপর্দ করেন। অতঃপর শয়তান তাহাদের সহিত যেমন ইচ্ছা ব্যবহার করে ও তাহাদিগকে দোযখের পথে নিয়া যায়। হে বোন্দাশীলের অধিবাসী! তোমরা যদি আমার আহ্বানে সাড়া দাও এবং আল্লাহ্‌র পথে ফিরিয়া আস, তবে অচিরেই দেখিতে পাইবে —তোমাদের সকল কষ্ট দূর হইয়া গিয়াছে। শয়তান তোমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না। তোমরা সুখে, শান্তিতে ও নিরাপদে বাস করিতে পারিবে।

হযরত শাহজালালের সে মর্মস্পর্শী ওয়াজে বহু অমুসলিম ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিল। হযরত তাহাদের জন্য দোয়া করিলেন ও তাহাদিগকে ইসলামের আইন কানুন শিক্ষা দিবার জন্য খলীফা জিয়াউদ্দীনকে নির্দেশ দান করিলেন।

অতঃপর হযরত শাহজালাল বিরাট দল পরিবেষ্টিত হইয়া সুরমা নদীর তীরে গমন করিলেন। পানি সত্যিই বিস্বাদ ছিল। তিনি উহাদ্বারা ওযূ করিলেন ও কুলি করিয়া নদীতে ফেলিলেন। খোদার মহিমা! বোন্দাশীলের লোকেরা আশ্চর্য হইয়া দেখিল, পানি সুস্বাদু হইয়া গিয়াছে। তাহারা এই মহান বোযর্গের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা খুঁজিয়া পাইল না।

—o—

হযরত শাহপ্রান (রহঃ)

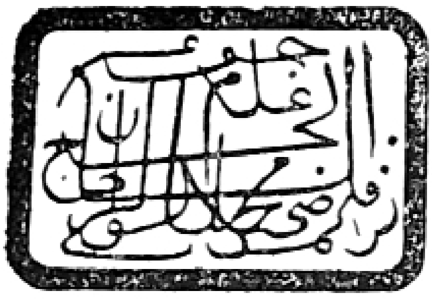

হযরত শাহপ্রান (রহঃ)

হযরত শাহপ্রান (রহঃ)এর পূর্বপুরুষগণ বোখারার অধিবাসী ছিলেন। শাহপ্রানের উর্দ্ধতন ৪র্থ পুরুষ শাহ জামালুদ্দীন বোখারা হইতে প্রথমে সমরকন্দ ও পরে তুর্কীস্থানে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। শাহপ্রানের পিতা খুব উঁচুদরের আলেম ও কামেল বোযর্গ ছিলেন। তাঁহার মাতাও খুব ধর্মপরায়ণা সুশীল পূণ্যবতী মহিলা ছিলেন। তিনি হযরত শাহজালাল (রহঃ)এরই সহোদরা।

কথিত আছে—হযরত শাহপ্রান যে দিন মাতৃগর্ভে স্থান লাভ করেন সেদিন পুর্বাকাশে একটি উজ্জ্বল তারকার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। বিখ্যাত বোযর্গ সৈয়দ হাদী বিল্লাহ উহা দেখিয়া মন্তব্য করেন যে, অচিরেই তুর্কীস্থানে একটি শিশু জন্মলাভ করিবে, যাহার উছিলায় আল্লাহ পাক বহু লোককে হেদায়াত নছীব করিবেন।

হযরত শাহপ্রান (রহঃ) গর্ভজাত ওলী ছিলেন। তাঁহার মাতা বলেন—শাহপ্রানের জন্মের নয় কিংবা দশমাস পূর্বে একদা শেষরাতে তাহাজ্জুদ নামায পড়িয়া আমি তাসবীহ পাঠ করিতে-ছিলাম। তাসবীহ পাঠ করিতে করিতে হঠাৎ একসময়ে আমি তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়ি। স্বপ্নে দেখি—পূর্বাকাশে চাঁদের ন্যায় বড় ও উজ্জ্বল একটি তারকা উদিত হইয়াছে। ইহার আলোক রশ্মি ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতে করিতে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে গিয়া পৌঁছিয়াছে। হঠাৎ চাহিয়া দেখি, আমার ডাহিন পার্শ্বে সাদা জামা ও সাদা লুঙ্গি পরিহিত এক বোযর্গ ব্যক্তি দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে আমার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাকে এইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া আমার যেন একটু লজ্জা

বোধ হইল। আমি একটু দূরে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইলাম। বোযর্গ আমার দিকে আগাইয়া আসিয়া বলিলেন, ভয় নাই; আল্লাহ্‌র খাস বান্দারা আল্লাহ ছাড়া আর কাহাকেও ভয় করে না। তুমি ঐ তারাটি ধরিবে কি? আমি বলিলাম, তা' কি করিয়া সম্ভব? ইহার উত্তরে বোযর্গ শুধু একটু মুচকী হাসিয়া ডাহিন হাতের শাহাদাত অঙ্গুলি দিয়া ইশারা করিলেন। অমনি তারাটি আমার নিকট চলিয়া আসিল। বোযর্গ বলিলেন, যাও ইহা তোমাকেই দান করিলাম। বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন। আমারও ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জাগিয়া দেখি ভোরের আলো তখন রশ্মি বিকিরণ করিতে শুরু করিয়াছে, মোয়াজ্জেনের কণ্ঠ হইতে ধ্বনিত হইতেছে —আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার—আল্লাহ শ্রেষ্ঠ, আল্লাহ মহান, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ—আল্লাহ ব্যতীত আর কেহ এবাদাতের যোগ্য নাই।

ওযু করতঃ ফজরের নামায পড়িয়া আমি আবার তাসবীহ পাঠ করিতে বসিয়া গেলাম, কিন্তু মন বসাইতে পারিলাম না। বার বার স্বপ্নের স্মৃতি মনে পড়িতে লাগিল। অতঃপর মসজিদ হইতে এশরাক নামায শেষ করিয়া আমার স্বামী যখন ঘরে ফিরিয়া আসিলেন তখন তাঁহাকে স্বপ্নের কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন, খোদার শোকর! আমিও অনুরূপ ধরনের একটি স্বপ্ন দেখিয়াছি। খুব সম্ভব আল্লাহ পাক তা'র আমানতের দায়িত্ব-ভার আমাদের উপর অর্পণ করিবেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কী সে আমানত? স্বামী ইহার কোন উত্তর না দিয়া যেন অনেকটা আত্মগত ভাবেই বলিলেন, আল্লাহ আমাকে ও তোমাকে সেই দায়িত্ব ভার বহন করার ক্ষমতা দিন। তাঁহার মত না হইলে গরীবের কি সাধ্য তাঁর ওলীকে লালন পালন করার।

হযরত শাহপ্রানের মাতা বলেন, স্বামীর এই উক্তি আমার কাছে অনেকটা হেঁয়ালীর মত মনে হইল। আমি কিছু বলিতে

গেলে তিনি আমাকে হাতের ইশারায় বারণ করিয়া দিয়া বলিলেন, আমি এই স্বপ্ন আর কাহারও কাছে ব্যক্ত না করি। বুঝিলাম, স্বপ্নটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তাই আর কোন কথা না বলিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলাম।

বিবি বলিলেন—এই ঘটনার অত্যল্প কাল পরেই আমি বুঝিতে পারি যে, আমি গর্ভবতী হইয়াছি। গর্ভাবস্থায় প্রায় রাত্রেই আমি আজব আজব স্বপ্ন দেখিতাম। উহার কোনটি স্বামীর কাছে ব্যক্ত করিতাম, কোনটি করিতাম না। কিন্তু—

শাহপ্রান যেদিন জন্মলাভ করে সেদিন দুপুর রাতের পর আমি স্বপ্নে দেখি—আমার ঘরখানা উজ্জ্বল আলোয় ভরিয়া গিয়াছে। পূর্বের দেখা সেই বোযর্গ ঘরের এক কোণে বসিয়া তাসবীহ পড়িতেছেন। তাঁহার সারা অবয়ব আনন্দ আভায় দীপ্তিমান। উপরে চাহিয়া দেখি, একটি পূর্ণাকৃতি চাঁদ গৃহের ছাদ ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া আসিতেছে। চাঁদটিকে ধরিবার জন্য আমি হাত বাড়াইলাম। অমনি উহা আমার কোলে আসিয়া নামিল। বলা বাহুল্য ঐ দিন সকালে সূর্যোদয়ের পূর্বেই শাহপ্রানের জন্ম হয়।

কথিত আছে—হযরত শাহপ্রান সুলতানুল আযকারের সবক হাসিল করিয়া জন্মলাভ করিয়াছিলেন। তিনি যখন জন্মলাভ করেন, তখন পার্শ্বে অবস্থানরত পরিচর্যাকারিণী মহিলাবৃন্দ "আল্লাহ আল্লাহ" যেকর শুনিতে পাইয়াছিল। বলা আবশ্যক, সুলতানুল আযকার হাসিল হইলে জিহ্বা দ্বারা যেকর করার প্রয়োজন পড়ে না। তখন সারা দেহ হইতেই আপনা আপনি যেকর জারী হইতে থাকে। গর্ভাবস্থায় হযরত শাহপ্রানের মা দিন রাত যেকেরে মগ্ন থাকিতেন। খুব সম্ভব তাহারই ফলে হযরত শাহপ্রান এই নেয়ামত হাসিল করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং গর্ভজাত ওলীরূপে পৃথিবীতে আগমন করিয়াছিলেন। আরও একটি প্রমাণ দেখুন—

হযরত শাহপ্রান তখন পাঁচ কি ছয় বছরের বালক মাত্র। পিতার নিকট বসিয়া তিনি কোরআন শরীফ পড়িতেছিলেন। এমন সময় একটি লোক আসিয়া তাঁহার পিতার নিকট বলিল, হুযুর! আমার একটি মাত্র ছেলে। ছেলেটিকে কে-বা কাহারা ধরিয়া নিয়া গিয়াছে। আজ তিনমাস যাবৎ তাহার কোন সন্ধান পাইতেছি না। বাঁচিয়া আছে কি মরিয়া গিয়াছে তাহাও জানি না। আমি বৃদ্ধ মানুষ। সংসারে একটি মাত্র প্রদীপকে হারাইয়া চতুর্দিক অন্ধকার দেখিতেছি। আমার স্ত্রীও কাঁদিয়া কাঁটিয়া অস্থির হইতেছে। হুযুর একটু দোয়া করুন, যেন আমার ছেলেটি ফিরিয়া আসে।

তদুত্তরে পিতার কিছু বলার আগেই বালক শাহপ্রান বলিয়া উঠিলেন—আজ মাগরিবের নামাযের আগেই তোমার ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসিবে। যাও! ঘরে ফিরিয়া তাহার খাওয়া-দাওয়ার এন্তেজাম কর। চিন্তার কোন কারণ নাই। আল্লাহ্‌র কুদরত অসীম! তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিতে পারেন।

তাঁহার বলার মধ্যে এমন এক বিশেষ ভঙ্গী ছিল যাহা তাঁহার বোযর্গ পিতাকেও বিস্মিত করিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এইরূপ নিশ্চয়তা সহকারে কথা বলিলে কি প্রকারে? হযরত শাহপ্রান তদুত্তরে পিতাকে কোরআন শরীফে বর্ণিত হযরত খেজের ও মূসা (আঃ)এর ঘটনা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন—আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা, তাঁর অগাধ জ্ঞান ভাণ্ডার হইতে দান করিয়া থাকেন। শুনিয়া শাহপ্রানের পিতা বুঝিতে পারিলেন যে, আল্লাহ-পাক তা'র ছেলেকে কামালিয়াত দান করিয়াছেন। জন্ম হইতেই সে ওলী। তিনি তাহার প্রাণ ভরিয়া আল্লাহ পাকের দরবারে মুনাজাত করিলেন।

হযরত শাহপ্রানের কথা সত্য হইয়াছিল। বৃদ্ধের নিখোঁজ পুত্রটি সেইদিনই মাগরিবের নামাযের পূর্বে ফিরিয়া আসিয়াছিল।

হযরত শাহপ্রান যখন দশ কি এগার বৎসরের বালক তখন তাঁহার পিতা ইন্তেকাল করেন। বিধবা মাতা ছেলের ভবিষ্যত চিন্তায় অস্থির হইয়া উঠিলেন। কি করিয়া তিনি সংসার চালাইবেন, কি ভাবে ছেলের শিক্ষা-দীক্ষার খরচ যোগাইবেন, ইহা নিয়া তিনি বড়ই চিন্তিতা হইয়া পড়েন।

একদিন এইভাবে তিনি ভারাক্রান্ত মনে বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময় বালক শাহপ্রান সেখানে আসিলেন। বলিলেন, মা। আপনি ভারাক্রান্ত কেন? এত কি চিন্তা করেন? তদুত্তরে মাতা তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—বাবা! আমি নিজের জন্য এতটুকু চিন্তার করি না। আমার যত ভাবনা তোমাকে নিয়া। তুমি কি ভাবে লেখাপড়া শিখিবে, কিভাবে তোমার ভবিষ্যত গড়িয়া উঠিবে, সেই চিন্তাই আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। আজ যদি তোমার পিতা জীবিত থাকিতে, তাহা হইলে আমাকে এত ভাবনা ভাবিতে হইত না।

শুনিয়া বালক শাহপ্রান মায়ের কোল ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, মা! আপনি কি মনে করিতেন যে বাবাই ছিলেন আমাদের অবলম্বন? যাহার বাবা নাই, সে কি দুনিয়ায় বাঁচিয়া নাই? মা-বাপ হারা হাযারো লাখো মানুষ, এখনও ত পৃথিবীতে টিকিয়া আছে। আল্লাহ-ই তাহাদিকে সকল প্রতিকুল অবস্থার মধ্য দিয়া টিকাইয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং আমাদের ভয়ের কি? আমরা আল্লাহ্‌র বান্দা। আল্লাহ আমাদের মনিব। সকল অবস্থায় তাঁহার প্রতি খুশী থাকাই আমাদের কর্তব্য। না মা! আপনি চিন্তা করিবেন না। আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করুন। আমি হলফ করিয়া বলিতে পারি, আমরা যদি আল্লাহ্‌কে রাজী করিতে পারি তবে কোন সমস্যাই আমাদের বিচলিত করিতে পারিবে না।

এতটুকু বালকের মুখে আল্লাহ্‌র প্রতি এইরূপ অবিচল ভক্তি ও বিশ্বাসের কথা শুনিয়া তাঁহার মা অত্যন্ত পুলকিত হইলেন। সুদীর্ঘ

কাল সাধনা করিয়াও যাহা তিনি পান নাই এই বালক তাহা বিনা আয়াসে হাসিল করিয়া ফেলিয়াছে। ছেলের গৌরবে তাঁহার বুক ভরিয়া গেল। তিনি মনে মনে আল্লাহ্‌র দরবারে তাঁহার ভবিষ্যত উন্নতি কামনা করিলেন।

ইসপাহানের বিখ্যাত বোযর্গ সৈয়দ কামালুদ্দীন শাহপ্রানের ওস্তাদ ছিলেন। তিনি তাঁহার নিকট তাফসীর, হাদীছ, ফেকাহ, মানতেক, ফালছাফা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন করেন। তাঁহার অধ্যয়নের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, একবার যে কিতাব তিনি পাঠ করিতেন তাহা আর কখনও ভুলিতেন না। কিন্তু তাঁহার একটুও গর্ব ছিল না। ব্যক্তিগত ভাবে তিনি অতিশয় শান্ত-শিষ্ট ও বিনয়ী ছিলেন। তাঁহার স্বভাবের কোমলতায় সবাই তাঁহাকে প্রীতির নজরে দেখিত।

পূর্বেই বলিয়াছি—হযরত শাহপ্রান জন্মগত ওলী ছিলেন। মাতৃগর্ভে থাকাকালেই তাঁহার সুলতানুল আযকার হাসিল হইয়াছিল। আর ইহা এমনই এক প্রকার এল্‌ম্‌ যাহার সর্বোচ্চ সোপানে পৌঁছিলেও মনের আকাংখা নিবৃত্ত হয় না।

তাই এলমে যাহেরে ব্যুৎপত্তি অর্জন করার পর হযরত শাহপ্রান মা'রেফাত বিদ্যায় অধিকতর জ্ঞান লাভ করার জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সত্য-পিপাসু মনে মাহবুব মাওলার প্রেমের আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

নেশাপুরে শাহ আমীন নামে এক বোযর্গ দরবেশ বাস করিতেন। জনসাধারণ তাঁহাকে মজনু আমীন বা পাগলা আমীন বলিয়া ডাকিত। তিনি কোথায় থাকেন, কি করেন—একথা কেহই জানিত না বা জানার আবশ্যকও মনে করিত না। কখনও এক সপ্তাহ, কখনও দুই সপ্তাহ পরে যখন তিনি মাথায় ঝাকড়া ঝাকড়া চুল ও রুক্ষ্ম মলিন বেশ নিয়া রাস্তায় বাহির হইতেন তখন তাঁহাকে পাগল ছাড়া আর কিছুই বলা যাইত না। কখনও তিনি আপন মনে বিড় বিড় করিয়া

পথ চলিতে থাকিতেন, কখনও একা একা হাসিতেন, এইসব দেখিয়া সাধারণ লোকেরা মনে করিত, লোকটি বদ্ধ পাগল। পাগল না হইলে সে এইরূপ করিবে কেন? কিন্তু—

যাহাদের চক্ষু ছিল তাহারা দেখিতে পাইয়াছিল যে, এই পাগলের খাজাঞ্চিখানা অসংখ্য অগণিত ধনরত্নে ভরপুর। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর নির্জন সাধনায় অতিবাহিত করিয়া তিনি অন্তর রাজ্যে এত অধিক মনিমানিক্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, দুনিয়ার সকল মানুষকে উহা বিতরণ করিতে থাকিলেও তাহা ফুরাইত না।

শাহ আমীন একটি পর্বত গুহায় রাত কাটাইতেন। সারারাত নির্জন সাধনায় অতিবাহিত হইত। দিনেরও বেশীর ভাগ তিনি গুহায় কাটাইতেন। এক সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহ পরে যখন তিনি বাহির হইতেন তখন আত্মপরিচয় গোপন রাখার জন্য তিনি সর্বতোভাবে চেষ্টা করিতেন। এতদসত্ত্বেও যাহাদের চিনিবার, তাহারা তাঁহাকে চিনিয়া লইয়াছিল এবং এইজন্য রাতের অন্ধকারে তাঁহারা তাহার গুহায় ভিড় জমাইত।

শাহ আমীনের নিয়ম ছিল—একটি লোককে মুরীদ করিবার আগে তাহার চরম পরীক্ষা গ্রহণ করিতেন। কাহাকেও গালি দিতেন, কাহাকেও বেত্রাঘাতে জর্জরিত করিতেন, কাহারও শরীরে হয়ত বা জ্বলন্ত অঙ্গার চাপিয়া ধরিতেন। এক কথায়—শিষ্যত্ব গ্রহণেচ্ছু সকল লোকের নিকটেই তিনি প্রথমে নিজেকে পাগলরূপে পেশ করিতেন। অতঃপর এতসব কিছু সহ্য করিয়াও যাহারা টিকিয়া থাকিতে পারিত, তাহাদিগকে তিনি মুরীদ করিতেন। আর যাহারা ইহা সহ্য করিতে পারিত না তাহারা তাঁহাকে পাগল মনে করিয়াই চলিয়া যাইত।

একদিন শাহ আমীন বসিয়া বসিয়া ধ্যান করিতেছিলেন। ভক্ত মুরীদগণ তাঁহার পশ্চাতে উপবিষ্ট থাকিয়া যেকর করিতেছিলেন। হঠাৎ শাহ আমীন রাগত স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"বদবখ্‌ত চেরা নমী

আইয়াদ, বদবখ্‌ত চেরা নমী আইয়াদ ?' হতভাগা আসিতেছে না কেন হতভাগা আসিতেছে না কেন ?

যেকর আযকার শেষে ভক্ত মুরীদগণের মধ্যে গুঞ্জরণ সৃষ্টি হইল— শাহপীর কাহার কথা বলিলেন, কে আসিতেছে না ? শাহ আমীন তাহাদিগকে ধমক দিয়া নিবৃত্ত করিলেন যেন আর তাহারা এ বিষয় অধিক কিছুই জানিতে না চায়।

—ইহার অল্প কয়েকদিন পরের কথা—হযরত শাহ্প্রান (রহঃ) এশার নামাযের পর মসজিদে বসিয়া কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিতেছিলেন। নির্জন নিস্তব্ধ রাত, কোথাও কেহ জাগিয়া নাই। এমন সময় হঠাৎ তাঁহার কানে একটি শব্দ আসিল, কে যেন বলিতেছে—বদ্‌বখ্‌ত চেরা নমী আইয়াদ ? চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন—কোথাও কেহ নাই। সমগ্র পৃথিবী সুপ্তির কোলে মগ্ন। মাত্র দুই একটি নিশাচর পাখী রাতের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মাঝে মাঝে কিচির মিচির করিয়া উঠিতেছে।

হযরত শাহপ্রান ভাবিলেন হয়তঃ বা তিনি ভুল শুনিয়াছেন। তাই আর এ বিষয় তিনি মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন মনে করিলেন না। কিন্তু না! পরবর্তী রাত্রে আবার যখন তিনি ঐ ভাবে কোরআন তেলাওয়াতে মগ্ন হইলেন তখনও ঐ একই ধরনের শব্দ তাঁহার কানে আসিল। তিনি তেলাওয়াত বন্ধ করিয়া মসজিদের চারিপাশ ঘুরিয়া আসিলেন। কিন্তু কোথাও কিছু নজরে পড়িল না।

শাহপ্রানের সন্দেহ জাগিল—ইহা জ্বীনের কারবার নয় ত ? গভীর উৎকণ্ঠার সহিত তিনি ব্যাপারটি অনুধাবনের চেষ্টা করিলেন।

তৃতীয় রাতে হযরত শাহ্প্রান আবারও কোরআন তেলাওয়াতে মগ্ন হইলেন। ভাবাবেগে তিনি অনেকটা আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। হঠাৎ কি একটা শব্দে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল। চাহিয়া দেখিলেন—মোটা কম্বলে আপাদমস্তক পরিবেষ্টিত একটি লোক মসজিদের চত্বরে পায়চারি করিতেছে। নিকটে যাইতেই

লোকটি বলিয়া উঠিল—শাহপ্রান, তোমার ঘুমন্ত আত্মার জাগার সময় কি এখনও হয় নাই? আজ তিনদিন যাবৎ তোমার পিছনে পিছনে দৌড়িতেছি। অথচ তোমার কোন সাড়া নাই।

হযরত শাহপ্রান জিজ্ঞাসা করিলেন—মহাত্মন! আপনি কে? কি জন্য আমাকে খুঁজিতেছেন? আগন্তুক এ কথার কোন জবাব না দিয়া বলিল, আগামীকাল নেশাপুর গেলে তোমার প্রশ্নের জবাব পাইবে। বলিয়া লোকটি আর দাঁড়াইল না। হন হন করিয়া মসজিদের বাহিরে পা বাড়াইল। হযরত শাহপ্রান তাঁহার পিছনে পিছনে ছুটিলেন। কিন্তু একটি খামের আড়াল হইতেই তিনি দেখিলেন, লোকটি অন্তর্হিত হইয়াছে। তিনি দৌড়িয়া এদিক সেদিক বহু খোঁজাখুঁজি করিলেন, কিন্তু কোথাও কাহারও সাড়া পাইলেন না।

কী আশ্চর্য ব্যাপার! মুহূর্তের মধ্যে কিসে কি হইয়া গেল। শাহপ্রান ব্যাপারটির আগা গোড়া অনুধাবন করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না।

হযরত শাহপ্রান আর ঘুমাইতে পারিলেন না। সারারাত মসজিদে বসিয়া তিনি কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিতে লাগিলেন। ফজরের আযানের সামান্য আগে তিনি একটু তন্দ্রাহত হইয়া পড়িলেন। দেখিলেন—এক বোযর্গ দরবেশ তাঁহাকে বলিতেছেন—শাহপ্রান, তোমাকে যাহা বলা হইয়াছে তাহাই কর। আগামী কাল তুমি নেশাপুর যাত্রা কর। নেশাপুর বাজারের নিকট গিয়া দেখিবে—পাগলবেশী একটি লোক রৌদ্রতপ্ত বেলাভূমির উপর শুইয়া রহিয়াছে। তাহাকে অবহেলা করিও না। সে তোমাকে নিষ্ঠুর ভাবে অভিবাদন জানাইবে। তাহার নিষ্ঠুরতায় যদি বিরক্তি বোধ কর, তবে তোমার সকল প্রচেষ্টা বাতিল হইয়া যাইবে। তোমার নাম তালিকা হইতে মুছিয়া ফেলা হইবে।

ফজরের আযানের শব্দে হযরত শাহপ্রানের তন্দ্রাভাব কাটিয়া গেল। তিনি বুঝিলেন, গতরাতের ঘটনা কোন অলৌকিক ব্যাপার

নয়। কোন বিরাট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আল্লাহ পাক তাহাকে আহ্বান করিয়াছেন। তিনি স্থির করিলেন—আর গড়িমসি করা নয়—আজই তিনি যাত্রা করিবেন।

ফজরের নামায জামাতে আদায় করিয়া হযরত শাহপ্রান আল্লাহ্‌র নামে নেশাপুরের পথে যাত্রা করিলেন।

উপরে প্রচণ্ড রৌদ্র, নীচে খরতপ্ত বেলাভূমি, সম্বল—একটি মাত্র নাম—"আল্লাহ"। এ নামের এমনই মাহাত্ম যে; যাহার অন্তর রাজ্যে উহা প্রবেশ করে, তাহাকে ক্ষুধায় কাতর করিতে পারে না। পিপাসায় দুর্বল করিতে পারে না, ঝড়-ঝঞ্ঝা, বিপদ-আপদ কোন কিছুই টলাইতে পারে না।

আজ পৃথিবীতে মুসলমানদের এত যে দুর্দশা—উহার মূল কারণ "আল্লাহ" নামের অভাব। মুসলমানের "আল্লাহ" শুধু তাহার জিহ্বাতেই আছে, অন্তরে তাঁহার স্থান নাই।

অনেক পরিশ্রম করিয়া, অনেক কষ্ট সহিয়া, অনেক দুর্গম মরুপথ অতিক্রম করিয়া হযরত শাহপ্রান যখন নেশাপুর গিয়া পৌঁছিলেন তখন আছরের আযান হইয়াছে। তাড়াতাড়ি ওযু করিয়া তিনি মসজিদে প্রবেশ করিয়া জামাতে আছরের নামায আদায় করিলেন।

হযরত শাহপ্রান প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যত কষ্টই হউক সেই পাগলবেশী দরবেশের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া তিনি পানি গ্রহণ করিবেন না।

আছরের নামায শেষ করিয়া তিনি দরবেশের সন্ধানে বাহির হইলেন। বেশী কষ্ট করিতে হইল না। কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই তিনি দেখিতে পাইলেন—পাগলবেশী একটি লোক বেলাভূমিতে শয়ন করিয়া আকাশের দিকে মুখ করিয়া আপন মনে বিড় বিড় করিয়া কি যেন বলিতেছে। তাঁহার পার্শ্বে পানিভরা একটি মাটির পাত্র।

শাহপ্রান বুঝিলেন, এত কষ্ট করিয়া যাহার সন্ধানে তিনি আসিয়াছেন, তিনি এই বোযর্গ। দুনিয়ার লোকের কাছে তিনি

পাগল বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন কিন্তু প্রকৃত সত্য এই যে, দুনিয়ার মানুষকেই তিনি পাগল মনে করিয়া থাকেন। —হযরত শাহপ্রান তাঁহার নিকট গমন করিয়া শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তাঁহাকে ছালাম দিলেন। তদুত্তরে পাগলবেশী দরবেশ তাঁহার দিকে একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়া পূর্বের মত আপন মনে বিড়বিড় করিতে লাগিলেন।

বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিল। তারপর হঠাৎ কি মনে হওয়ার দরবেশ তাঁহার দিকে পানির পাত্রটি আগাইয়া দিলেন। হযরত শাহপ্রান একবারে সবটুকু পানি নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার মনে হইল—বেহেশত হইতে কে যেন তাঁহার জন্য 'শরাবনতহুরা' রাখিয়া গিয়াছে।

ক্ষণিক পর দরবেশ পাগলের ভঙ্গীতে মাটি হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাটিতে লাগিলেন। হযরত শাহপ্রানও তাঁহার পিছনে পিছনে চলিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর দরবেশ পিছন দিকে ফিরিয়া তাঁহাকে জোরে এক ঘুষি লাগাইয়া দিলেন। সে ঘুষির তেজ সামলাইতে না পারিয়া হযরত শাহপ্রান মাটিতে পড়িয়া গেলেন। অদূরে একটি লোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছিল। সে দৌড়িয়া আসিয়া হযরত শাহপ্রানকে বলিল, আপনি নিশ্চয়ই বিদেশী মুসাফির। এই লোকটিকে আপনি চিনিতে পারেন নাই। সে একটা বদ্ধ পাগল। তাঁহার কাছেও যাইবেন না। কোন্ সময় কোন্ অঘটন ঘটাইয়া বসে তাহা বলা যায় না। চলুন আমার সাথে, আপনাকে পথ দেখাইয়া দিব।

ইহার উত্তরে হযরত শাহপ্রান কিছুই বলিলেন না। তিনি বরং পূর্বের মত সেই পাগল দরবেশের পিছনে পিছনে ছুটিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর দরবেশ যখন দেখিল যে, লোকটি না-ছোড় বান্দার মত তাহার পিছনে পিছনে চলিয়াছে। তখন তিনি খানিকটা পিছনে আসিয়া তাহাকে এমন জোরে লাথি মারিলেন যে, হযরত শাহপ্রান

তাহার ফলে ৪।৫ হাত দূরে ছিটকাইয়া পড়িলেন। —লাথি খাইয়াও হযরত শাহপ্রান তাঁহার সঙ্গ ছাড়িলেন না। মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা— কপালে যাহাই ঘটুক, উদ্দেশ্য হাসিল না হওয়া পর্যন্ত তিনি এক পা-ও পিছনে হটিবেন না।

ক্ষণিকপর কি মনে হওয়ায় পাগল দরবেশ তাঁহার নিকট আগমন করিলেন ও তাঁহাকে মাটি হইতে টানিয়া তুলিয়া অনেকটা স্নেহশীল পিতার ন্যায় নিজ হাতে তাঁহার গা ঝাড়িয়া দিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে গুহার মুখে নিয়া গেলেন।

দরবেশ গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করার পর পরই হযরত শাহপ্রান গুহায় প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, তাঁহারই মত আরও কয়েকজন দরবেশ সেখানে বসিয়া বসিয়া যেকর করিতেছে। শাহপ্রান বুঝিলেন, ইহা তাঁহার আস্তানা, মা'রেফাত শিক্ষার্থীদের কা'বা কেন্দ্র।

গুহায় প্রবেশ করার পর দরবেশের রুদ্রমূর্তি আর রহিল না। তিনি পার্শ্বে রক্ষিত একটি সোরাহী হইতে সামান্য পানি ঢালিয়া লইয়া হযরত শাহপ্রানের মাথায় ঢালিয়া দিলেন। অতঃপর তাঁহাকে কেবলামুখী করিয়া বসাইয়া বাম হাতে তাঁহার চক্ষু চাপিয়া ধরিয়া ডাহিন হাতে জোরে জোরে তাঁহার পিঠের উপর সাতটি থাপ্পড় মারিলেন। এক একটি থাপ্পড়ে হযরত শাহপ্রানের দৃষ্টির সীমা এক এক আসমান ছাড়াইয়া যায়। এইভাবে সাতটি থাপ্পড়ে তাঁহার সপ্ত আসমানে গিয়া উন্নীত হইল। হযরত শাহপ্রান দিব্য দৃষ্টি দিয়া সপ্ত আসমান, আলমে নাছুত, আলমে মালাকুত ইত্যাদি দর্শন করিলেন। এক পর্যায়ে আরশে এলাহী দর্শন করিয়া তিনি খুব কান্নাকাটি করিলেন।

সারারাত এইভাবে কাটিয়া গেল। ভোর বেলা ফজরের আযান হওয়ামাত্র দরবেশ তাঁহাকে মসজিদে যাওয়ার নির্দেশ দিয়া নিজে কোথায় যেন চলিয়া গেলেন। সারাদিন আর তিনি ফিরিলেন না। হযরত শাহপ্রানও গুহায় গেলেন না। মাগরিবের নামাযের পর

আবার তাঁহারা মিলিত হইলেন। রাত যেকর-আযকার, মোরাকাবা-মোশাহাদায় কাটিয়া গেল। এইভাবে তিনরাত অতীত হওয়ার পর দরবেশ তাঁহাকে বলিলেন—তোমাকে যা দিবার তাহা দেওয়া হইয়াছে। এবার তুমি নিজের পথ নিজে বাছিয়া লও, আমার কর্তব্য শেষ।

হযরত শাহপ্রান আরও কিছুদিন তাঁহার খেদমতে থাকিতে চাহিলেন। কিন্তু দরবেশ বলিলেন, তা' হয় না। আমি নির্দেশের বাহিরে কোন কিছুই করিতে পারি না। আল্লাহপাক তোমার জন্য ভিন্ন পথ তৈরী করিয়া রাখিয়াছেন। সে পথের গুরু দায়িত্ব তোমাকে অবশ্যই বহন করিতে হইবে। তুমি যাও! আমার অনেক কাজ এখনও বাকী। সকল অবস্থায় আল্লাহ্‌র মর্জিকেই প্রাধান্য দিও, তাহা হইলে কোন কাজেই অসুবিধা হইবে না। যাও, খোদা হাফেয।

হযরত শাহপ্রান দরবেশের নিকট হইতে বিদায় লইয়া গুহার বাহিরে আসিলেন। লোকালয় তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি নেশাপুরের অদূরে এক জঙ্গলে গিয়া আশ্রয় লইলেন। সেখানে কয়েকজন বোযর্গ ওলীর সহিত তাঁহার সাক্ষাত হইল। তিনি তাহাদের সহিত মা'রেফাত সম্পর্কিত বহু বিষয় আলাপ করিলেন ও একটি নির্দিষ্ট স্থান বাছিয়া লইয়া তথায় ধ্যানমগ্ন হইলেন।

ইহার কয়েক বৎসর পরের কথা—হযরত শাহজালাল (রহঃ) তখন হিন্দুস্থানের বেলায়েত লাভ করিয়া যাত্রার উদ্যোগ করিতেছিলেন। কামেল ওলীগণ তাঁহার বেলায়েত প্রাপ্তি ও হিন্দুস্থান যাত্রার সংবাদ এল্‌হামযোগে জানিতে পারিয়াছিলেন। হযরত শাহপ্রানও এই সংবাদ অবগত হইলেন। তিনি মামার (হযরত শাহ জালালের) সহিত হিন্দুস্থান যাইতে মনস্থ করিলেন।

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে—হযরত শাহজালাল (রহঃ) যখন হিন্দুস্থানের পথে যাত্রা করেন তখন বারজন দরবেশ তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিলেন। এই বারজনের মধ্যে তাঁহার ভাগিনেয় হযরত শাহপ্রানও ছিলেন।

বোযর্গ মামার সঙ্গী হইয়া হযরত শাহপ্রান অপূর্ব প্রাণশক্তির অধিকারী হইলেন। কামেল অলীর প্রাণ-পরশে তাঁহার অন্তর রাজ্য অধিকতর দীপ্ত ও সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সিলেট পৌঁছিয়া হযরত শাহজালাল তাঁহাকে দ্বীনের কাজে লাগাইয়া দিলেন। তরফ, ইটা, লংলা, হবিগঞ্জ ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে তিনি হেদায়াতের কাজে লিপ্ত রহিয়াছিলেন।

সিলেট বিজিত হওয়ার পর হযরত শাহজালালের কাজ অনেকটা বাড়িয়া গিয়াছিল। তাবলীগের জন্য লোক নির্বাচন, নির্বাচিত লোকদের তা'লীম প্রদান, তাহাদের এলাকা নির্দ্ধারণ, চতুর্দিক হইতে আগত লোকদের দর্শন দান, ভক্ত মুরীদবৃন্দের কার্যকলাপ নিরীক্ষণ, তাহাদিগকে মা'রেফাতের সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছাইবার জন্য ফায়েয দান, নিয়োজিত শাসনকর্তাকে পরামর্শ দান ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাঁহাকে খেয়াল রাখিতে হইত। এইজন্য প্রথম হযরত শাহপ্রানের প্রতি তিনি বিশেষভাবে দৃষ্টি দান করিতে পারেন নাই। এমন কি ভিতরে ভিতরে তিনি যে মা'রেফাতের অনেক উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছিয়া গিয়াছেন, তাহাও দেখার মত সুযোগটুকু তাঁহার হয় নাই। অবশেষে সেই সুযোগ আসিল বিশেষ একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া—

সিলেট আসার পথে হযরত শাহজালাল (রহঃ) খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়ার মাননীয় অতিথি হিসাবে কয়েকদিন দিল্লীতে কাটাইয়াছিলেন। দিল্লীতে কিভাবে তিনি খাজা সাহেবের অতিথি হন তাহা আমরা এই পুস্তকের প্রথমদিকে আলোচনা করিয়াছি। হযরত শাহজালাল যখন দিল্লী হইতে বিদায় গ্রহণ করেন তখন খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া তাঁহাকে একজোড়া কবুতর উপহার দেন। সিলেট আসার পর ক্রমাগত সেই কবুতরের বংশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে ও উহা বিরাট একঝাঁক পাখীতে পরিণত হয়। কবুতরগুলি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা ছিল—এইগুলি হযরত শাহজালালের বিশেষ বরকতময় পাখী। যাহার ঘরের চালায় গিয়া উহা বসিবে বা যে ঘরে

উহা বাসা বাঁধিবে সে ঘরে খোদার রহমত নামিয়া আসিবে এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাহা ধন সম্পদে পরিপূর্ণ হইয়া শান্তি নিকেতনে পরিণত হইবে। এইজন্যই কবুতরগুলি কেহ ধরিতে বা শিকার করিতে চাহিত না। এমন কি দরবারের খাস খাদেমগণও উহার একটি কবুতর শিকার করিতে সাহস পাইতেন না। কবুতরগুলি সম্পর্কে তাদের ধারণাও সাধারণ লোকের ধারণার মতই ছিল ।

হযরত শাহপ্রান কিন্তু এই সব ধারণার পরোয়া করিতেন না। তিনি প্রতিদিন, একটি করিয়া কবুতর শিকার করিতেন ও জবেহ করতঃ পালকগুলি রাখিয়া দিয়া গোশত রান্না করিয়া ভক্ষণ করিতেন। হযরত শাহজালালের নিজ ভাগিনেয় বলিয়া খাদেমগণও এ বিষয়ে কোন কথা তাঁহার কর্ণগোচর করেন নাই ।

হঠাৎ একদিন কবুতরগুলির প্রতি হযরত শাহজালালের দৃষ্টি অকর্ষিত হইল। তিনি দেখিলেন, কবুতরের সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা অনেক কম। তিনি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে খাদেমগণ তাঁহাকে সব কথা খুলিয়া বলিলেন ।

হযরত শাহপ্রান ঐ সময় নিজ হুজরায় বসিয়া মোরাকাবা করিতেছিলেন। একজন খাদেম গিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল---হযরত মুরশিদ আপনাকে তলব করিয়াছেন। ইহার উত্তরে হযরত শাহপ্রান তাঁহাকে অন্য কোন কথা না বলিয়া শুধু জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার মুরশিদের কতটি কবুতর কম পড়িয়াছে? খাদেম বলিল, তা' প্রায় হাযার খানেক কবুতরের মধ্যে মাত্র এক্ দেড়শ কবুতর রহিয়াছে। অবশিষ্ট কবুতরগুলি নাই। হযরত শাহপ্রান তাহাকে বলিলেন, একটুখানি অপেক্ষা কর, তোমার কবুতরগুলি আমি ফেরত দিতেছি ।

এই বলিয়া তিনি হুজরার এক পার্শ্বে রক্ষিত কবুতরের পালকগুলি আনিয়া দরজার সামনে দাঁড়াইয়া বাতাসে উড়াইয়া দিয়া বলিলেন, যাও খোদার হুকুমে তোমরা শাহজালালের দরবারে গিয়া উপস্থিত হও ।

খোদার কি অসীম কুদরত। যেই না বলা—অমনি এক একটি পালক এক একটি কবুতরে রূপান্তরিত হইয়া ঝাঁক বাঁধিয়া উড়িয়া গিয়া হযরত শাহজালালের দরবারে উপস্থিত হইল।

হযরত শহজালাল বিস্মিত হইলেন। ভিতরে ভিতরে শাহপ্রান যে এতদূর সামনে অগ্রসর হইয়াছেন ইহা তাঁহার দেখিবার সুযোগ হয় নাই। এবার যখন দেখিলেন, তখন তাঁহার অন্তরে একদিকে যেমন আনন্দ জাগিল অন্যদিকে তেমনি একটু দুঃখও বোধ করিলেন। দুঃখবোধ করিলেন এইজন্য যে, এই ভাবে কারামাত প্রকাশ করা আল্লাহ্‌র ওলীদের নীতি নয়। কারণ ইহাতে সাধারণ মানুষের মনে হেদায়াতের তুলনায় ব্যক্তির প্রভাবই পড়ে বেশী। যা'র ফলে তাহারা দ্বীনের সত্যিকার প্রেরণা উপলব্ধি করিতে পারে না।

আল্লাহ্‌র ওলীদের নিকট 'কারামাত' কোন বিচিত্র ব্যাপার নয়। সময়ে তাহাদের মনের অজ্ঞাতেই উহার দুই একটি ঘটনা প্রকাশ পাইয়া বসে। আবার কখনও কখনও স্বেচ্ছাকৃত ভাবে তাঁহারা উহা প্রকাশ করিয়া থাকেন। যখন তাঁহারা মনে করেন যে, এই স্থলে লোকের চাহিদা মোতাবেক একটি কারামাত প্রকাশ পাইলে অনেকগুলি লোক হেদায়াত পাইতে পারে কিংবা যখন দেখেন যে, কোনও ব্যাপারে বিশেষ কারামাত প্রকাশিত হইলে বহুসংখ্যক লোকের উপকার হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তখনই শুধু তাহারা স্বেচ্ছায় কারামাত প্রকাশ করিয়া থাকেন।

কারামাত প্রকাশের ব্যাপারেও তাহাদিগকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। যাহাদের উদ্দেশ্যে কারামাত প্রকাশ করা হইবে, তাহারা উহা কি ভাবে গ্রহণ করিবে, উহা দ্বারা তাহাদের হেদায়াতের পথ খোলাসা হইবে কি না বা কারামাতের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া তাহারা কারামাত প্রদর্শনকারীর প্রতি অনুরক্ত হয় কি না! ইত্যাদি নানা বিষয় তাহাদিগকে পর্যালোচনা করিয়া দেখিতে হয়।

পাঠকবর্গের হয়ত মনে থাকিতে পারে—সুরমা নদীর পানি বিস্বাদ হওয়ায় এবং তদপরিবর্তে পানযোগ্য কোন পানি না পাওয়ায় বোন্দাশীলের জনগণ যখন অস্থির তখন হযরত শাহজালাল নিজেই সেখানে গমন করিয়া মিঠা পানির জন্য দোয়া করিবার পূর্বে তাহাদিগকে হেদায়াতের পথে আহবান করিয়াছিলেন। ইচ্ছা করিলে তিনি সিলেটে থাকিয়াই আল্লাহ্‌র হুকুমে সুরমা নদীর পানি মিঠা করিয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই, কারণ এমতাবস্থায় সাধারণ লোকেরা হযরত শাহজালালকে (নাউযুবিল্লাহ) খোদার সমপর্যায়ে নিয়া ফেলিতে পারিত এবং হেদায়াতের পরিবর্তে তাহারা শেরেকীর পথে চলিয়া যাইত—একজন ওলীআল্লাহ তাহা করিতে পারেন না। এইজন্যই তিনি বোন্দাশীল গিয়া প্রথমে তাহাদিগকে হেদায়াতের পথে আহবান করিয়া আল্লাহ্‌র মহিমা প্রকাশের নিদর্শন স্বরূপ আল্লাহ্‌রই নির্দেশে কারামাত দেখাইয়া সুরমা নদীর পানি মিঠা করিয়া দিয়াছিলেন। যাহা হউক এবার মূল আলোচনায় ফিরিয়া আসি—

হযরত শাহজালাল এক নির্জন মুহূর্তে শাহপ্রানকে তলব করিয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিলেন, বাবা! তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতিতে আমি খুব খুশী হইয়াছি। আল্লাহ পাক তোমাকে আরও তারাক্কী দিন। কিন্তু একটি কথা—এইভাবে কারামাত প্রদর্শন করিলে সাধারণ লোকদের অন্তরে উহা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে। সকল লোকের ধারণ ক্ষমতা এক রকম নয়। হযরত মুসা (আঃ) মো'জেযা দেখাইতে গিয়া হাতের লাঠি মাটিতে ফেলার সাথে সাথে উহা বিরাট সর্পাকৃতি ধারণ করিয়াছিল। একই ঘটনা ফেরাউনও দর্শন করিয়াছিল, যাদুকরগণও দর্শন করিয়াছিল। কিন্তু যাদুকরগণ উহাকে আল্লাহ্‌র মহিমা মনে করিয়া ঈমান আনিয়াছিল, আর পাপাত্মা ফেরাউন উহাকে যাদু মনে করিয়া ঘোর অবিশ্বাসীই রহিয়া গিয়াছিল। কাজেই সকলের ধারণ ক্ষমতা যখন এক নয়, তখন লোকের বিবেক বুদ্ধি যাচাই করিয়া কারামাত প্রদর্শন করা উচিত।

ইহার পর হযরত শাহজালাল (রহঃ) শাহপ্রানকে খাদিমনগর নামক স্থানে হুজরা নির্মাণের উপদেশ দান করিয়া তথাকার স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের নির্দেশ দান করিলেন।

বোযর্গ মামার নির্দেশে হযরত শাহপ্রান খাদিমনগর চলিয়া গেলেন এবং সেখানে একটি টিলার উপর হুজরা নির্মাণ করিলেন। জীবনকাল পর্যন্ত তিনি এইস্থানেই ছিলেন এবং এ এলাকার অধিবাসীবৃন্দের মধ্যে ইসলাম প্রচার করিয়া বহু লোককে আল্লাহ্‌র পথে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন।

হযরত শাহজালালের নিয়ম ছিল—তাবলীগে দ্বীনের কাজে যখন যাহাকে নিয়োগ করিতেন, তাঁহাকে উহার সবদিক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। এতদসত্ত্বেও নির্দিষ্ট স্থানে যাওয়ার পর যদি কোন সমস্যা দেখা দিত এবং মোবাল্লেগগণ উহার সমাধান দিতে না পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা মোরাকাবায় বসিয়া যাইতেন। অতঃপর হযরত শাহজালাল তাহাদিগকে রূহানীভাবে উহার সমাধান বলিয়া দিতেন।

একবার হযরত শাহপ্রান এইরূপ একটি সমস্যায় পড়িয়া গেলেন—হযরত শাহপ্রানের মর্মস্পর্শী ওয়াজে মুগ্ধ হইয়া এক হিন্দু ব্রাহ্মণ মুসলমান হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ তাঁহার স্ত্রীকে খুব ভালবাসিত এবং স্ত্রীও তাহাকে ভালবাসিত। মুসলমান হওয়ার পর তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে বলিল, তুমি জাত কুল বিসর্জন দিয়া ম্লেচ্ছ ধর্ম গ্রহণ করিয়াছ, এখন আর আমি তোমার সংসারে থাকিতে পারি না। স্থির করিয়াছি—আগামী কালই আমি পিত্রালয়ে চলিয়া যাইব।

শুনিয়া ব্রাহ্মণের চক্ষু ত চড়কগাছ! যে স্ত্রীকে সে জীবন প্রাণ দিয়া ভালবাসে সে-ই আজ এই কথা বলে! তাঁহার ধারণা ছিল, হয়তঃ বা তাঁহার স্ত্রীও মুসলমান হইবে। কিন্তু, ফল হইল তা'র বিপরীত। সে তৎক্ষণাৎ হযরত শাহপ্রানের দরবারে উপস্থিত হইয়া সবিস্তারে সব কথা খুলিয়া বলিল।

হযরত শাহপ্রান তাঁহাকে বলিতে যাইতেছিলেন যে, ঈমান ও ইসলামের সামনে এহেন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু লোকটির সকাতর করুণ চাহনি ও স্ত্রীর প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ দেখিয়া আর তাহা বলা হইল না। তিনি তাহাকে ক্ষণিক অপেক্ষা করিতে বলিয়া হুজরায় প্রবেশ করতঃ মোরাকাবার মাধ্যমে হযরত শাহজালালের সাথে যোগাযোগ করিলেন। হযরত শাহজালাল বলিলেন, লোকটিকে বল, সে যেন তাহার স্ত্রীকে পুনর্বার মুসলমান হইবার জন্য অনুরোধ করে। যদি সে ইহাতে রাজী হয় ত ভাল, অন্যথা আল্লাহ-ই তাঁহার হেদায়েতের ব্যবস্থা করিবেন; তাহার চিন্তা করিবার কোনই দরকার নাই।

মোরাকাবা পরিত্যাগ করিয়া হযরত শাহপ্রান লোকটিকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, তোমার চিন্তার কোন কারণ নাই। আল্লাহ্র উপর ভরসা কর। তিনিই তাঁহার হেদায়েতের ব্যবস্থা করিবেন। তুমি গিয়া তাহাকে আবারও ইসলাম গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাও।

লোকটি চলিয়া গেল এবং পীরের নির্দেশ মোতাবেক স্ত্রীকে ইসলাম গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিল। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী রাজী হইল না। বলিল, তুমি জাত কুল বিসর্জন দিয়া ম্লেচ্ছ হইয়াছ বলিয়া কি আমাকেও তাহাই হইতে হইবে? তোমার কোন কথাই আমি শুনতে চাই না। আগামীকাল সকালেই আমি চলিয়া যাইব। তদুত্তরে লোকটি আর কিছু না বলিয়া মসজিদে চলিয়া গেল এবং সারারাত সেখানেই কাটাইল।

ভোর বেলা জামাতে ফজরের নামায আদায় করিয়া সে আর বাড়ীতে গেল না। কারণ তাহার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, স্ত্রী এতক্ষণে তার পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছে। সে হযরত শাহপ্রানের দরবারে গিয়া বিমর্ষ চিত্তে বসিয়া রহিল।

হযরত শাহপ্রান তখন মোরাকাবায় লিপ্ত ছিলেন। ক্ষণিক পর মোরাকাবা শেষ করিয়া বাহিরে আসিতেই তিনি দেখিতে পাইলেন,

গতকল্যের সেই নও-মুসলমান লোকটি বসিয়া আছে। বলিলেন, কি আশ্চর্য! তুমি এখনও বাড়ীতে যাও নাই? তোমার স্ত্রী যে তোমার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। আহা! বেচারীর সারারাত ভাল ঘুম হয় নাই! লোকটি কিছু বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু হযরত শাহপ্রান তাহাকে বারণ করিয়া দিয়া বলিলেন, তুমি আগে বাড়ী যাও! তারপর সব কথা শুনিব।

পীরের নির্দেশ মোতাবেক লোকটি বাড়ীর পথে চলিল, মনে তখনও ধারণা—হয়তঃ বা স্ত্রী এতক্ষণে তার পিত্রালয়ে অবস্থান করিতেছে। দরজা অাঁটা শূন্য গৃহেই তাহাকে প্রবেশ করিতে হইবে। কিন্তু ঘরের দরজায় পা দিয়া প্রথম দৃষ্টিতেই তাহার যাহা নজরে পড়িল তাহা দেখিয়া তাহার চক্ষু স্থির হইয়া গেল। দেখিল—তাহার স্ত্রী এক পার্শ্বে খাবার সাজাইয়া রাখিয়া জায়নামাজে কেবলামুখী হইয়া বসিয়া চক্ষু বন্ধ করতঃ 'আল্লাহ আল্লাহ' যেকের করিতেছে। ক্ষণিক অভিভূতের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। স্বামীর পদশব্দ টের পাইয়া স্ত্রী যেকের বন্ধ করতঃ চক্ষু খুলিল। বলিল, এই নাও—সারারাত তোমার কিছুই খাওয়া হয় নাই। তাড়াতাড়ি নাশতা সারিয়া লও। স্বামী বলিল কিন্তু…। স্ত্রী বলিল, তোমার সন্দেহের কারণ নাই। বে-দ্বীনের পাক তোমাকে খাইতে হইবে না। আমি মুসলমান। শুনিয়া স্বামীর আনন্দের সীমা রহিল না। খাইতে বসিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি ভাবে মুসলমান হইলে? স্ত্রী তখন বলিতে লাগিল—

তোমরা চলিয়া যাওয়ার পর আমি দরজা বন্ধ করতঃ প্রদীপ নিভাইয়া শয়ন করিয়াছিলাম। দুশ্চিন্তায় ঘুম আসিতেছিল না। বেশ কিছুক্ষণ পর একটু তন্দ্রাহত হইয়া পড়িতেই দেখিতে পাইলাম—এক মহাপুরুষ আমার ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার পরিধানে সাদা পোশাক, মাথায় সাদা পাগড়ি। তাঁহার দেহের ঔজ্জ্বল্যে সারা গৃহাভ্যন্তর উজ্জ্বল হইয়া গিয়াছে। তিনি আমার

মাথার উপরে হাত রাখিয়া বলিলেন, বেটী তোমার স্বামী মুসলমান হইয়াছে, তোমার বাপ-মা ও ভাই বোনেরা সকলেই মুসলমান। তুমি কেন মুসলমান হইবে না? পড়—এই বলিয়া তিনি আমাকে ওযু করাইলেন ও অতি স্নেহভরে কাছে বসাইয়া তিন বার কালেমা শাহাদাত পাঠ করাইলেন। অতঃপর ঘুম হইতে জাগিয়া দেখি, আমার চেহারা ও হাত পা ভিজা রহিয়াছে। এমন কি ঘরের মধ্যে ওযুর পানির দাগও রহিয়াছে।

বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া আমি তাহার শিখানো কালেমা শাহাদাতটি স্মরণ করিতে চেষ্টা করিলাম। খোদার শোকর! উহা আমার অন্তরে এমনভাবে গাঁথা হইয়া গিয়াছে যে, জীবনে আর কোনদিন ভুলিব না। বলিয়া সে তাহাকে কালেমা শাহাদাতটি পাঠ করিয়া শুনাইল।

আহার শেষে তাহারা উভয়ে সংবাদ নিয়া জানিল যে, তাহার শ্বশুরকুলের সবাই মুসলমান হইয়াছে। ইহার পর তাহারা স্বামী স্ত্রী উভয়ে হযরত শাহপ্রানের দরবারে গিয়া তাঁহার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করিল ও বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া স্থানীয় এক আলেমের কাছে ইসলাম ধর্মের রীতি নীতি শিক্ষা করিতে লাগিল।

কামেল ওলীর দৃষ্টি যাহার উপর পড়ে, তাহার অবস্থা এমনই হয়। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর ব্যাপারে দুই বোযর্গের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছিল। একজন হযরত শাহজালাল অপর জন হযরত শাহপ্রান (রহঃ)। তাঁহাদের উভয়ের নেকদৃষ্টির ফলে গোটা দুইটি পরিবার যাহারা হয়তঃ কোনদিনই সত্যের পরশ লাভ করিতে পারিত না—ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিল।

হযরত শাহজালালের দরগাহ হইতে পাঁচ কি ছয় মাইল দূরে একটি টিলার উপরে হযরত শাহপ্রানের মাযার শরীফে অবস্থিত। তাঁহার মাযার সম্পর্কেও লোকমুখে অনেক কাহিনী শুনা যায়। সে-সব লিপিবদ্ধ করিতে গেলে স্বতন্ত্র একখানা পুস্তক তৈরী হয়। আমরা

এখানে তাঁহার সাম্প্রতিক কালের একটি বাস্তব সত্য ঘটনা উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গের ইতি দিতে চাই—

জনৈক চিত্রশিল্পী সদলবলে ছবি তুলিতে গিয়াছিলেন সিলেটে। বিভিন্ন জায়গায় ছবি তোলার পর প্রত্যাবর্তনের পথে সঙ্গীরা বলিল, আমরা হযরত শাহজালাল ও শাহপ্রানের দরগাহ না দেখিয়া যাইব না। দলপতি রাজী হইলেন ও সাঙ্গ-পাঙ্গ সহ হযরত শাহজালালের দরগাহ যেয়ারত করিয়া (অর্থাৎ ঘুরিয়া ফিরিয়া, দেখিয়া শুনিয়া) শাহপ্রানের দরগার দিকে রওয়ানা হইলেন। পূর্বেই বলিয়াছি একটি ক্ষুদ্র টিলার উপরে হযরত শাহপ্রানের মাযার অবস্থিত। যেয়ারত কারীরা যখন তাঁহার মাযার যেয়ারত করিতে আসে তখন টিলার নীচে জুতা খুলিয়া রাখিয়া খালি পায়ে উপরে আরোহণ করে ইহাই নিয়ম। সেমতে যেয়ারতকারী শিল্পীবৃন্দের সকলেই স্ব স্ব জুতা খুলিয়া রাখিয়া খালি পায়ে টিলায় আরোহণ করিলেন। কিন্তু যিনি দলপতি, তিনি আর জুতা খুলিলেন না। সদম্ভে জুতা মোজাসহ উপরে উঠিতে গেলেন। দরগার খাদেম বলিল, জনাব! কামেল ওলীর মাযারে জুতা পায়ে দিয়া যাওয়া বে-আদবী। আপনি দয়া করিয়া জুতা রাখিয়া আসুন। ভদ্রলোক জবাব দিলেন—আহা বাবা! একটু আগে বলিলে না কেন? তাহা হইলে ত পাখানাও রাখিয়া আসিতে পারিতাম। —আল্লাহতাআলা তাঁহার ওলীর প্রতি বে-আদবী কখনও বরদাস্ত করেন না। এ ক্ষেত্রেও করিলেন না! ভদ্রলোকের পাখানা যাহাতে আর তাহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে না হয় সেই ব্যবস্থাই তিনি করিলেন।

হযরত শাহপ্রানের মাযার শরীফ যে টিলার উপরে অবস্থিত তাহা সদর রাস্তা হইতে খানিকটা দূরে। তাই যেয়ারতকারীদের সুবিধার জন্য সদর রাস্তা হইতে টিলার পাদমূল পর্যন্ত আরেকটি ছোট রাস্তা নির্মাণ করা হইয়াছে। যেয়ারতকারীরা এখন অনায়াসে ট্যাক্সি বা রিক্সায় চড়িয়া মাযার পর্যন্ত আসিতে পারে।

শিল্পী ভদ্রলোকেরা টেক্সিতে চড়িয়া মাযার দেখিতে আসিয়াছিলেন। ফিরিবার পথে দলপতি সবাকে আগে উঠাইয়া নিজে পরে উঠিলেন। ট্যাক্সির প্রশস্ততার তুলনায় লোকসংখ্যা বেশী ছিল। তাই দলের প্রধান শিল্পী (যিনি জুতা সহ মাযারে গিয়াছিলেন) দরজা খোলা রাখিয়া কোনও প্রকারে ঠাসাটাসি করিয়া বসিলেন।

বলা বাহুল্য, দরজা খোলা থাকায় স্বাভাবিক ভাবেই ভদ্রলোকের ডাহিন পাখানা একটু বাহিরে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল।

যথাসময় ড্রাইভার গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল। শিল্পীবৃন্দ মনের আনন্দে গান গাহিতে গাহিতে ছুটিয়া চলিলেন।

খোদার মহিমা! ছোট রাস্তা অতিক্রম করিয়া বড় রাস্তায় উঠিবার জন্য গাড়ী যেই না মোড় নিল, অমনি পিছন দিক হইতে একটি ট্রাক আসিয়া উহাকে ধাক্কা দিল। ড্রাইভার পাশ কাটাইয়া যাইতে চেষ্টা করিয়াছিল তাই ট্রাকটি সরাসরি পিছনে ধাক্কা না দিয়া উহার পার্শ্বে আঘাত করিল। সে আঘাতে ভদ্রলোক প্রধানশিল্পীর ডাহিন পাখানা একেবারে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। ঘটনার আকস্মিকতায় তিনি সাথে সাথেই সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। হাসপাতালে নেওয়ার অনেক্ষণ পর যখন তিনি চেতনা ফিরিয়া পাইলেন, তখন দেখিলেন, তাহার মুখের কথাই সত্য হইয়াছে। একখানা পা তিনি রাখিয়া আসিয়াছেন।

দুনিয়ার সকল উদ্ধত দাম্ভিকের জন্য ঘটনাটি উপদেশমূলক হইয়া থাকুক, আমরা এই কামনাই করি।

সিলেটে সুফীবাদের প্রভাব

হযরত শাহজালাল (রহঃ) ও তাঁর খলীফাগণ সিলেট শহর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা সমূহে যে আধ্যাত্মিক প্রভাব রাখিয়া গিয়াছিলেন, যুগ যুগ ধরিয়া তাহা বিদ্যমান ছিল। মুসলিম সমাজ আজও

তাঁহার সে প্রভাব উপেক্ষা করিতে পারে নাই। শতাব্দী কালের ব্যবধানে তাঁহার শিক্ষা ও সংস্কৃতির যদিচ পরিবর্তন ঘটিয়াছে তথাপি তাঁহার প্রভাব একেবারে নিঃশেষিত হইয়া যায় নাই।

সিলেটের সাহিত্যও এই প্রভাব হইতে রেহাই পায় নাই। হযরত শাহজালালের পর সিলেটের যে সব মুসলমান কবি কবিতা রচনা করিয়াছেন তাহাদের অনেকের কবিতায় এই প্রভাব দেখা যায়। নিম্নে উহার কতিপয় নমুনা পেশ করা হইল—

জীবন আমার স্বপন সম অবশেষে যাবে চলে
একটু হেসে, একটু কেঁদে, এক নিমেষে কথা বলে।
শিশির যেমন নিশির পরে
তেমন করে পড়ব ঝরে
জলবিম্ব যেমন করে উঠে পুনঃ মিশে জলে
জীবন আমার স্বপন সম অবশেষে যাবে চলে।
আকাশ জুড়ে উঠবে তারা
ফুটবে কুসুম ভারা ভারা
চাঁদটি যখন মারবে উকি আমি তখন মাটির তলে
জীবন আমার স্বপন সম অবশেষে যাবে চলে।
ডাকবে পাখী শাখে শাখে
জাগবে পাখী পাখীর ডাকে
উঠবে রবি নদীর বাঁকে হয়তঃ আমি মিশব ধূলে
জীবন আমার স্বপন সম অবশেষে যাবে চলে
হয়ত আমার কবর পরে
একটি কুসুম পড়বে ঝরে
হয়তঃ পথিক চলে যাবে বসে বারেক বকুলতলে
জীবন আমার স্বপন সম অবশেষে যাবে চলে।

এই কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন খান বাহাদুর দেওয়ান একলিমুর রেজা। কবিতাটির ভাব সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক। জীবন স্বপ্নের মত,

রাত্রিবেলার শিশিরের মত, জলবিম্বের মত, এ জগতে উহার অবস্থান ক্ষণকাল মাত্র। কোন মানুষই পৃথিবীর বুকে চিরস্থায়ী হইয়া আসে নাই। মানুষ পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, তবুও আকাশে তারা উঠিবে, চন্দ্রোদয় হইবে, সূর্য কিরণ রশ্মি দান করিবে, ভোরের পাখী গান গাহিবে, ফুল বাগানে ফুল ফুটিবে, এক কথায় পৃথিবী তা'র স্বাভাবিক নিয়মেই পরিচালিত হইবে কিন্তু যা'র জন্য এত সব কিছু সে উহা ভোগ করিতে পারিবে না। তবে কেন মিছা পৃথিবীর মায়ায় আবদ্ধ হওয়া?

মরমী কবি হাসান রাজা স্বভাব-কবি ছিলেন। শত রাজৈশ্বর্যের মধ্যে থাকিয়াও তিনি শান্তি-সুখ দেখিতে পান নাই। তিনি নিতান্ত সাদাসিদা জীবন যাপন করিতেন বলিয়া বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহাকে বিদ্রূপ করিত। বস্তু-জগতের প্রতি তাঁর ঔদাসিন্য এত চরমে পৌঁছিয়াছিল যে, তিনি যে একজন রাজা, দেশের মহামান্যজন, সে খেয়ালটুকু তাঁহার ছিল না। একবার তাহার সুহৃদবর্গ তাঁহার বাসগৃহ খালি দেখিয়া বলিলেন, তুমি দেশের রাজা, বিত্ত-বিভব তোমার যথেষ্ট, এহেন অবস্থায় এই জীর্ণ কুটিরে থাকা তোমার সাজে না। তদুত্তরে রাজা হাসান সহজ গ্রাম্য ভাষায় ছন্দাকারে যে কথা কয়টি বলেন, তাহা এখানে বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলিলেন—

'লোকে বলে ঘরবাড়ী ভালা নায় আমায়
কি ঘর বানাইমু আমি শূন্যেরি মাঝার।
ভাল করি ঘর বানাইয়া কয়দিন থাকব আর
আয়না দিয়া চাইয়া দেখি পাকনা চুল আমার।
এই ভাবিয়া হাসান রাজা ঘর দুয়ার না বান্ধে
কোথায় নিয়া রাখবা আল্লায় এর লাগিয়া কান্দে।

কবিতাটির ভাষা যেমন সহজ, উহার ভাবও তেমনি মর্মস্পর্শী। ভাল ঘর, ভাল বাড়ী দিয়া কী হইবে? মস্তকে বার্ধক্যের চিহ্ন

ফুটিয়া উঠিছে। জীবন পাখী ঝুলন্ত অবস্থায় আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে বিরাজ করিতেছে। অচিরেই পৃথিবীর সকল মায়া পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত আকাশে মিশিয়া যাইতে হইবে। এমতাবস্থায় সুন্দর বাড়ী, সুন্দর ঘর কোন্ কাজে আসিবে? মরণের পর আল্লাহ কোথায় নিয়া রাখিবেন তাহা কে জানে? মানুষ যখন তাহার পরিণতি জানে না, তখন কোন আশায় সে নিশ্চিত হইয়া থাকে?

বাগানে ফুল ফোটে, কিন্তু তাহাতে কবি-হৃদয় তৃপ্ত হয় না। হৃদয় বাগানেই যদি ফুল না ফুটিল তবে জীবনের কি মূল্য? তাই তাসহীফা বিবির আক্ষেপ—

"কামিনী কমলের প্রাণে আকুল পরাণে
শুন সই ঐ কমল ফুটেছে কাননে।
কেন গুরু ফোটে না ফুল মমহৃদি বাগানে!
আকুল পরাণে!
কামিনী কমলের ঘ্রাণে, আকুল পরাণে
ঐ কমল দেখিবার আশে
বের হলেম সন্ন্যাসীর বেশে।

সব জায়গায় এ ফুল ফোটে না। যিনি আধ্যাত্মিক গুরু, তিনিই জানেন উহা কিভাবে ফুটাইতে হয় এবং কিরূপ হৃদয়কুঞ্জে উহা প্রস্ফুটিত হয়। তাই কবি গুরুর নিকট হৃদয়ের উদ্বেলিত ভাব প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—

শুনেছি ফুটেছে ফুল গুরুজী বাগানে
আকুল পরাণে।
কামিনী কমলের ঘ্রাণে, আকুল পরাণে
কেন গুরু ফোটেনা ফুল মমহৃদি বাগানে
আকুল পরাণে?

মুন্সী ইফরান আলী কসবা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। বাল্য বয়সেই তিনি সংসারের প্রতি নিরাসক্ত হইয়া পড়েন ও সঙ্গীত চর্চার

প্রতি মনোনিবেশ করেন। তাঁহার সুললিত কণ্ঠের প্রাণ মাতানো সুর যে-ই শুনিত সে-ই মুগ্ধ হইত। তিনি যখন গান ধরিতেন তখন মনে হইত, যেন এক ভিন্ন জগতের মানুষ প্রেয়সীর বিরহ-বেদনায় অস্থির হইয়া ভাবালুতা মনে বিলাপ করিতেছে। গানের ভাষায় তিনি কখনও কখনও রূপক শব্দ প্রয়োগ করিয়া বিচিত্র ভঙ্গীতে মনের ভাব প্রকাশ করিতেন। নিম্নে তাহার এইরূপ একটি গান উদ্ধৃত হইল—

দেখ মন পড়িল বাকী জায়—
সনের খেরাজ বাকী রইল, উস্থুল নাই তৌজি চিঠায়।
জুতিয়া খাইলাম জমি বাড়ী জমার কি উপায়?
এই যে দিন পাওনা চিন
তোমার লাটের তারিখ বইয়া যায়।
জমিদারের জমিদারী রাখা বিষম দায়
জমা উস্থুল না হইলে তালুক নিলাম ডাকায়
জমির জমা সনে সনে আদায় করা হয়
আর দখল রাখিতে হয়, ছাড়লে না পাওয়া যায়।
অধীন ইরফান কয়, মোর কি হইবে উপায়
জমিতে দখল নাই মোর জমা না হইল আদায়।

রূপক ভাষা প্রয়োগ করিয়া কবি ভাবোদ্বেল হৃদয়ের অভিব্যক্তি অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। আল্লাহর এই বিশাল জমিদারীতে তিনি জোত দখল করিয়াছেন কিন্তু খাজনা আদায় করেন নাই। পৃথিবীর আলোবাতাস গ্রহণ করিতেছেন অথচ তা'র বিনিময়ে মহান জমিদার আল্লাহ তাআলাকে তিনি কিছুই দিতে পারেন নাই। তাঁহার দেওয়া বিপুল দানের পরিবর্তে যে পরিমাণ এবাদত তাহার করা উচিত ছিল তাহা তিনি করেন নাই! এইহেতু তিনি উদ্বিগ্ন। মনে শংকা ভরা—খাজনা দিলাম না জোত দখলে রাখি কি ভাবে?

সৈয়দা হাবীবুন্নেছা ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন মহিলা কবি ছিলেন। তিনি গ্রাম্য সহজ ভাষায় অনেক কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার

এই কবিতাগুলিতেও স্থফীবাদের যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার লেখা কবিতাবলীর মধ্য হইতে এখানে একটি মাত্র কবিতা উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই প্রসঙ্গ শেষ করিব—

"কিসের বড়াই কররে মন মাটির তন লইয়া
কোন ঘড়ি পরাণ পাখী যাইব যে উড়িয়া।
খালি পিঞ্জিরা রইব পড়ে এই অসার ভবে
কাঁদিয়া আসিবে তোমার ভাই বোন সবে।
চোখের জল মুছিয়া তারা সাদা কাফন দিয়া
সবে মিলে এই মতে দিবে যে সাজাইয়া
কিসের বড়াই কররে মন মাটির তন লইয়া
কোন ঘড়ি পরাণ পাখী যাইব যে উড়িয়া।
তারপরে তুলিয়া লইব কাঠের চারার মাঝে
পালঙ্ক, চকি বিছ্না বালিস না আসিব কাজে।
হবীবুন্নেছা কয় খুলে যত কিছু মিছা
সকলি অসার কেবল খোদারই নাম হাছা।

কবিতাটি যদিচ খুব উচ্চাঙ্গের নয় এবং ইহার মধ্যে শিল্পীর সূক্ষ্মতারও পরিচয় পাওয়া যায় না তবুও ইহা আধ্যাত্মিক ভাব রসে ভরপুর।

কবির মনে দুনিয়ার অসারতা প্রবল হইয়া দেখা দিয়াছে। মাটির দেহ লইয়া বড়াই করিবার কোন সার্থকতাই তিনি দেখিতে পান না। কোন্ সময় যমদূত তাঁহার কালোহাত বিস্তার করিয়া প্রাণপাখী কাঁড়িয়া লইবে তাহা কাহারও জানা নাই। মাটির দেহ মাটিতেই পড়িয়া থাকিবে। ভাই বোন আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব কেহই তাহাকে এতটুকু সাহায্য করিবে না। চোখের দুই ফোটা অশ্রু ফেলিয়া তাহারা তাহাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাইবে। তারপর তাহারা তাঁহাকে সাজাইয়া গুছাইয়া মরণখাটে শয়ন করাইবে। খাট পালঙ্ক বিছানা চৌকি কোন কিছুই তাঁহাকে দেওয়া হইবে

না। যে সাধের বস্তুগুলি সংগ্রহ করিবার জন্য সে জীবনভর চেষ্টা করিয়াছে, উহার কিছুই তাহার সঙ্গে যাইবে না, সুতরাং পার্থিব বস্তুর ইহাই যখন অবস্থা তখন মরণশীল মানুষের কাছে উহার মূল্য কি, কেন তার জন্য এত প্রচেষ্টা ?

কবির মনে তাই দুনিয়ার প্রতি বিরক্তি জন্মিয়া গিয়াছে। পার্থিব কোন বস্তুতেই তাহার মোহ নাই। উহাদের অসারতা সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। কেবল একটি নাম, একটি মাত্র স্বত্বা তাঁহার কাছে সত্য। তিনি হইলেন নিখিল বিশ্বের অধিপতি মহান স্রষ্টা আল্লাহ তাআলা।

এইসব কবিতা ও তৎকালীন বিভিন্ন সাহিত্যিকদের রচনাবলী পাঠ করিলে আরও একটি বিষয় আমাদের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠে। উহা এই যে, প্রাচীনকালের লোকেরা অধুনাযুগের লোকদের মত শিক্ষা দীক্ষায় এত উন্নত না হইলেও তাহারা নিতান্তই সরলপ্রাণ ছিলেন। তাহাদের প্রতিটি কবিতা ও রচনার মধ্যে প্রাণের পরশ বিদ্যমান। প্রাণের ভাষাই হইত তাহাদের ভাষা। আজকালকার কবি সাহিত্যিকদের মত তাহারা কৃতিত্ব দেখাইবার জন্য দুর্বোধ্য জটিল শব্দ খুঁজিয়া বেড়াইতেন না। মনে যখন যে ভাব উদয় হইত, তাহাই ভাষার রূপ ধারণ করিয়া প্রকাশ পাইত লেখনীর মাধ্যমে। তদুপরি তাহাদের সৃজনী শক্তিও ছিল স্বাভাবিক। বহু লোক স্বভাব কবি ছিলেন। আজকাল যেমন ভাষা শিক্ষা করিয়া কবি-সাহিত্যিকদের বিভিন্ন রচনা ও কবিতাবলী অধ্যয়ন করিয়া ভাব সংগ্রহ করিতে হয় তখনকার দিনের লোকদের এরূপ করিতে হইত না। তাহাদের ভাবও যেমন ছিল স্বাভাবিক, ভাষাও ছিল তেমনি স্বাভাবিক। ভাষার অলংকার বৃদ্ধির জন্য তাহারা আদৌ কোন চেষ্টা করিতেন না। বরং ভাবের অভিব্যক্তি তাহাদের ভাষার শ্রীবর্ধনে সাহায্য করিত। আধুনিক কবি সাহিত্যিক ও প্রাচীন কালের কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে ইহাই পার্থক্য।

সিলেটের প্রাচীন ইতিহাস

প্রাচীন যুগে সিলেট

সিলেট জেলার প্রাচীন ইতিহাস ঐতিহ্যময়। নদ-নদী ঘেরা এই জেলাটি যেন প্রকৃতির এক বিচিত্র অবদান। সমতল প্রান্তর জলাচ্ছাদিত বালুকাময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টিলা, পানি ভরা হাওর, গাছপালা, ফলফুল এই জেলার প্রধান বৈশিষ্ট্য। কথিত আছে—প্রসিদ্ধ গায়ক আব্বাছউদ্দীন সিলেট ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন কোন এক রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে। ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি যখন সুরমা নদীর তীরে যান তখন তিনি ভাব বিহ্বল হইয়া পড়েন। নদীতীরের প্রাকৃতিক বৈচিত্র ও সুরমার ঢেউ তাহার অন্তরে অপূর্ব ভাব জাগাইয়া তোলে। ভাবের আবেশে তিনি গাহিয়া উঠেন—

"এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল মিঠা নদীর পানি
খোদা তোমার মেহেরবানী

প্রাচীন যুগে অষ্ট্রিক জাতীয় লোকেরা সিলেটে বসবাস করিত। ইহারা কৃষিকাজে বেশ পাকা ছিল? তাহারা ধান, নারিকেল, কলা, পান, সুপারি, আদা, হলুদ ও বিভিন্ন ধরণের তরী-তরকারী উৎপাদন করিত। অনেকে অনুমান করেন, তাহারা তুলার চাষও করিত। ওসময় দেশীয় মুদ্রা হিসাবে কড়ির প্রচলন ছিল। লোকেরা কড়ি দিয়া কেনা-বেচা করিত। আজকাল আমরা কথায় কথায় পয়সার সাথে কড়ি শব্দের প্রয়োগ করিয়া বলি—":পয়সা-কড়ি"—উহার মূল কারণ আদিকালের সেই কড়ি ব্যবস্থা। অষ্ট্রিকেরা লেখা পড়া জানিত না বা ওসময় বর্তমান কালের মত লেখা পড়ার তেমন কোন সুব্যবস্থাও ছিল না। হিসাব ঠিক রাখার জন্য লোকেরা নিজেদের সাধারণ বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী কিছু কিছু গণনা পদ্ধতি ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা দিয়াই তাহারা কাজ চালাইত। কুড়ি বা বিশ পর্যন্ত ছিল তাহাদের

গণনার দৌড়। কুড়ির বেশী হইলে তাহারা এক কুড়ি, দুই কুড়ি, তিন কুড়ি এইভাবে গণনা করিত। কুড়ির পরে যাহা অবশিষ্ট থাকিত সেগুলির হিসাব করিত তাহারা এক কুড়ি পাঁচ, দুই কুড়ি দশ বা তিন কুড়ি সাত বলিয়া।

অষ্ট্রিকদের পরে এদেশে আসে মঙ্গোলীয় জাতি। মঙ্গোলীয়রা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। উঁচু ও নীচু। উচ্চশ্রেণীর মঙ্গোলীয়রা প্রধানতঃ আসামের কাছাড় জেলা ও ত্রিপুরা রাজ্যে বাস করিত। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা বাস করিত সিলেটের বিভিন্ন এলাকায়।

মঙ্গোলীয়দের পরে এদেশে আসে আর্যজাতি। ইহারা ছিল বলিষ্ঠ আকৃতিবিশিষ্ট। সভ্যতার দিক দিয়া তাহারা অষ্ট্রিক ও মঙ্গোলীয়দের চাইতে অনেক বেশী উন্নত ছিল। তাহারা সমাজবদ্ধ ভাবে বাস করিত ও কঠোর ভাবে সামাজিক আইন কানুন মানিয়া চলিত। শিল্প-কলায়ও ইহারা বেশ উন্নত ছিল। কৃষিকাজ ছাড়াও তাহারা হস্ত শিল্পে বেশ পাকা ছিল। এককথায় বলিতে গেলে এদেশে আর্যরাই প্রথমে সভ্যতার বীজ বপন করে।

ইহার পরে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মুসলমানগণ এদেশে আসেন এক বিপ্লবী জাতি হিসাবে। তাহাদের আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ধর্মপ্রচার। আজ হইতে সুদীর্ঘ দেড় হাজার বছর পূর্বে আরব-দুলাল, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বিশ্ব মানবকে যে নূতন পথের সন্ধান দিয়াছিলেন সেই পথে আহ্বান জানানোর জন্যই তাঁ'র অনুসারীগণ এদেশে আগমন করিয়াছিলেন। মুসলমানদের আগমণের ফলে এদেশে কত বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল, পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ তাহা হযরত শাহজালালের জীবনী অধ্যায়ে কিছুটা জানিতে পারিয়াছেন।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে উড়িষ্যা ও পশ্চিম বঙ্গের পাঠানরা মোগলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। মোগলদের শক্তি তখন

পূর্ণ যৌবনা। তাহারা পাঠানদের বিতাড়িত করিয়া উড়িষ্যা ও পশ্চিম বাংলায় নিজেদের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লয়। বিতাড়িত পাঠান সম্প্রদায় তখন পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন দুর্গমস্থানে আসিয়া আশ্রয় লয় ও শক্তি সঞ্চয় করিতে থাকে। ইহাদের অনেকে সিলেটের পার্বত্য অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করিয়া দেয়। সিলেটে এখন যাহারা নিজেদের নামের শেষে "খান" উপাধি ব্যবহার করে তাহাদের কিছু কিছু এই বিতাড়িত পাঠানদেরই বংশধর।

তুর্কী আমলে সিলেট

হিজরী তৃতীয় শতকের প্রখ্যাত আরব পর্যটক সোলায়মান সয়রাফী ভ্রমণ করিতে করিতে একবার সিলেটে আসিয়াছিলেন। তাঁ'র ভ্রমণ কাহিনীতে দেখা যায়—ঐ সময় সিলেট ও চট্টগ্রাম খুব প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। সিলেটে বন্দরবাজার ও চালিবন্দর বলিয়া এখনও যে দুইটি জায়গার নাম প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়, খুব সম্ভব ইহা ঐ সময় হইতেই চালু হইয়াছে।

হযরত শাহজালাল সিলেট জয় করেন ১৩০৩ সালে। ইহার পূর্বে গৌড় গোবিন্দ ছিল সিলেটের নরপতি। হযরত শাহজালাল তাহাকে নিজ আধ্যাত্মিক শক্তিবলে পরাস্ত করিয়া সিলেট দখল করেন। হযরত শাহজালাল নিজে দরবেশ ছিলেন, তাই দেশের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ না করিয়া নূরুল হুদা কেরামত সাইদী হোসেনী নামক তদীয় এক সঙ্গী দরবেশের হস্তে সমর্পণ করেন। এই নূরুল হুদাই পরবর্তীকালে হায়দার গাজী নামে পরিচিত হন। হায়দার গাযীর পরে যে সমস্ত নৃপতি সিলেটের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদের সকলের নাম ইতিহাসের পাতায় স্থান পায় নাই বলিয়া এখানে উল্লেখ করা গেল না।

মোগল কর্তৃক সিলেট বিজয়

১৬১২ সালে সিলেট মোগলদের অধিকারে আসে। মোগলগণ স্থাপত্য শিল্পে খুবই দক্ষ ছিল। বাংলাদেশের নানা স্থানে তাহাদের স্থাপত্য শিল্পের কিছু কিছু নমুনা এখনও দেখা যায়।

বাংলাদেশকে নিজেদের অধিকারে রাখার জন্য মোগল ও পাঠানদের মধ্যে বহুদিন হইতেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়া আসিতেছিল। মোগলরা পাঠান শক্তিকে আমল দিতে চাহিত না, আর পাঠানরাও তাহাদের বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহিত না। এইভাবে বহুদিন যাবৎ মোগল ও পাঠান শক্তির সংঘর্ষ বিদ্যমান ছিল।

পাঠান বীর খাজা ওসমান ছিলেন তখন বাংলাদেশের একটি ক্ষুদ্র অংশের শাসনকর্তা। বেশীর ভাগ ছিল তখন মোগলদের অধিকারে।

খাজা ওসমান মানসিংহ কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া উড়িষ্যা হইতে ময়মনসিংহের বোকাই নগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ওসময় বাংলার সুবাদার ছিলেন ইসলাম খাঁ। ইসলাম খাঁর আদেশে তাঁ'র সেনাপতি শেখ কামাল ওসমানের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন এবং তাঁহাকে ময়মনসিংহ হইতে তাড়াইয়া দেন। নিরুপায় ওসমান তখন লাউড়ের পথে সিলেট জেলায় প্রবেশ করেন এবং রাজ নগরের হিন্দু রাজা সুবিদ নারায়ণকে পরাজিত ও নিহত করিয়া তথায় নিজ আধিপত্য বিস্তার করেন।

সুবিদ নারায়ণের চারিজন পুত্র ছিল। পিতার মৃত্যুতে তাহাদের মনোবল একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করা ত দূরের কথা তাহারা স্বেচ্ছায় ওসমানের দরবারে গিয়া বশ্যতা স্বীকারপূর্বক ইসলাম ধর্মে দীক্ষা লইল। মুসলমান হওয়ার পর তাহাদের নাম হইল, যথাক্রমে—জামাল খান, কামাল খান, হাজী খান ও ঈছা খান। রাজ নগরের বিভিন্ন এলাকায় এখনও ইহাদের বংশধর দেখিতে পাওয়া যায়।

সিলেট দখল করার পর ওসমান পতন উসার গ্রামে রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি নিজ শক্তি সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকেফহাল ছিলেন।

ওসমান বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, মোগল শক্তির মোকাবিলায় টিকিয়া থাকিতে হইলে তাহার শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি করিতে হইবে। তাই তিনি নিকটস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিগুলির সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া নিজ শক্তি বৃদ্ধি করিতে প্রয়াসী হন। যে সকল পাঠান মোগল শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া সিলেটে আশ্রয় নিয়াছিল তাহাদের নেতা ছিলেন বায়জীদ কাররানী। ওসমান বায়জীদ কাররানীর সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া তাহাকে নিজ দলে ভিড়াইয়া লন। তিনি বানিয়াচুঙ্গের সমান্তরাজ আনোয়ার খাঁ ও মতঙ্গের পাহলোয়ানের সহিতও বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন।

সুবাদার ইসলাম খাঁ এই সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত করিলেন। সৈন্য প্রেরণের আগে তিনি ওসমানকে বশ্যতা স্বীকারের আহ্বান জানাইয়া দূত প্রেরণ করিলেন। ওসমান জবাব দিলেন—

"আমি ভাগ্যাহত এক পাঠান নরপতি। ভাগ্য বিপর্যয়ে আমার সকল গৌরব ভুলিয়া গিয়া দেশের এক প্রান্তে পড়িয়া রহিয়াছি। আমি তোমাদের কোন ক্ষতি করিতেছি না বা করিবার পরিকল্পনাও আমার নাই। তোমরা অফুরন্ত শক্তির অধিকারী। দেশের বিরাট অংশ তোমাদের অধিকারে। এতদ্‌সত্বেও যদি তোমরা সন্তুষ্ট না থাক এবং আমার প্রতি বিরূপ হও, তবে আমি শেষবারের মত আমার ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিতে সচেষ্ট হইব। আমার সামনে থাকিবে দুইটি পথ। যদি নিয়তি তোমাদের অনুকূলে রায় দেয় তবে তোমরাই বিজয় পতাকা উত্তোলন করিবে, আর যদি আমার পক্ষে রায় দেয়, তবে আমি উহার চূড়ান্ত পর্যায় দেখিয়া ছাড়িব। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করিয়া রহিয়াছি। দেখি—নিয়তি আমাকে কোথায় নিয়া যায়—"

ওসমানের এই তেজোদৃপ্ত জবাবে ইসলাম খাঁ বুঝিলেন, বিনা যুদ্ধে এই পাঠান বীরকে বশ্যতা স্বীকার করানো যাইবে না। তিনি

সুজাত খানের নেতৃত্বে এক বিরাট সৈন্যদল তাহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন।

মোগল বাহিনী ঢাকা হইতে যাত্রা করিয়া সরাইলে গিয়া পৌঁছিল। সুজাত খানের নির্দেশে নৌবাহিনী সরাইলেই থাকিয়া গেল এবং স্থল-বাহিনী মেঘনা নদীর উপকূল ধরিয়া ৩৪ মাইল পথ অতিক্রম করতঃ তরফের দুর্গ দখল করিল। তরফ হইতে পাঁচ মাইল দূরে ছিল পুটি-জুরীর দুর্গ। মোগল বাহিনী সেখানেও আক্রমণ চালাইল। পুটিজুরীর দুর্গের ভার ছিল ওসমানের ভাই ওয়ালী খানের উপর। ওয়ালীখান খুব সাহসী ছিলেন না। মোগল বাহিনীর আক্রমণের সাথে সাথে তিনি কোনরূপ প্রতিরোধ ব্যবস্থা না করিয়াই পলায়ন করিলেন ও ভাইএর সাথে মিলিত হইলেন। ইহার পর মোগলবাহিনী ওসমানের রাজধানী পতন উসার গ্রাম হইতে ১৩ মাইল দূরে দৌলম্ভা-পুরের নিকটস্থ জলাভূমিতে গিয়া সমবেত হইল।

এই আক্রমণ প্রতিরোধ কল্পে ওসমান বাছাই করা দুই হাজার অশ্বারোহী ও পাঁচ হাজার পদাতিক সৈন্যসহ আগাইয়া আসিলেন।

প্রভাত সূর্য তখন রশ্মি ছড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিল। এমনি সময়ে উভয় পক্ষে রণ দামামা বাজিয়া উঠিল। ওসমানের কতিপয় সাহসী যোদ্ধা জলাভূমি অতিক্রম করিয়া মোগল বাহিনীকে আক্রমণ করিল।

এদিকে মোগল বাহিনীর কম্যাণ্ডো ইফতিখার খান পূর্বেই ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তিনিই সর্বাগ্রে পাঠান বাহিনীকে আক্রমণ করিয়া গৌরব অর্জন করিবেন। তিনি বাছাই করা কতিপয় সৈন্যসহ গোপন পথে বিল অতিক্রম করিয়া অতর্কিতে পাঠান বাহিনীর বাম বাহুর উপরে আক্রমণ করিলেন। এই বাহিনীর দায়িত্ব ছিল ওসমানের ভাই ওয়ালী খানের উপর। কিন্তু তিনি সাহসী যোদ্ধা ছিলেন না বলিয়া মোগল বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণে হতচকিত হইয়া গেলেন। তাঁহার সৈন্যরা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পলায়ন করিতে লাগিল। এই অবস্থা দেখিয়া ওসমান নিজে আগাইয়া আসিলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে

ইকতেখার খানকে পরাজিত ও নিহত করিয়া গৌরবের অধিকারী হইলেন।

মোগলবাহিনীর সেনাপতি কেশোয়ার খান ছিলেন অসম সাহসী যোদ্ধা। পাঠানবীর শের ময়দান গোপন পথে জলাভূমি পার হইয়া তাহার দলকে অতর্কিতে আক্রমণ করিলেন। হতচকিত মোগল সৈন্যগণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। কেশওয়ার খান নিহত হইলেন। এইভাবে পাঠান বাহিনী একের পর এক আঘাত হানিয়া চলিল। বিজয় সুনিশ্চিত ভাবিয়া তাঁহারা আনন্দানুভব করিতে লাগিল কিন্তু—

হঠাৎ এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় যুদ্ধের গতি অন্যদিকে মোড় নিল। সূর্য তখন প্রায় মধ্য গগনে চলিয়া গিয়াছে। ওস্‌মান হাতীর পিঠে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ পরিচালনা করিতেছিলেন। এমন সময় নিহত ইফতেখারখানের এক অনুগত চর তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ভীমবেগে একটি তীর নিক্ষেপ করিল। তীরটি ওসমানের বাম চক্ষু কোটরে প্রবেশ করিল। ওসমান ভাবিলেন, এই অবস্থায় আর যুদ্ধ পরিচালনা সম্ভব নয়। কিন্তু তাহাতে সৈন্যদের মনোবল নষ্ট হইয়া যাইতে পারে ভাবিয়া তিনি হাতীর পিঠে থাকা অবস্থায়ই নিজ হাতে তীরটি টানিয়া বাহির করিলেন। ডান চক্ষুর সাথে বাম চক্ষুর পেশী মিলিত থাকে, সুতরাং তীর টানিয়া বাহির করার সাথে সাথে তাঁহার ডান চক্ষুটিও নষ্ট হইয়া গেল। ওসমান চিরতরে অন্ধ হইয়া পড়িলেন।

প্রচুর রক্তপাতের দরুন ওসমানের জীবনকাল ঘনাইয়া আসিয়াছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি মৃত্যুবরণ করিলেন।

ওসমানের পুত্র মুমরীজ পিতার মৃতদেহ হাতীর পিঠে রাখিয়া মরিয়া হইয়া মোগল বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত উভয় পক্ষে প্রচণ্ড লড়াই চলিল। কিন্তু শেষ রক্ষা আর হইল না। ক্রমে পাঠান বাহিনীর শক্তি কমিয়া আসিতে লাগিল। দুপুর রাতের পর মুমরীজ রণে ভঙ্গ দিয়া পিতার মৃতদেহ নিয়া রাজধানী উসার চলিয়া আসিলেন।

ঐ সময় রাজপুতদের মধ্যে একটি নৃশংস প্রথা চালু ছিল। যুদ্ধে পরাজয় বরণ করিলে তাহারা বিজয়ীদের কবল হইতে নিজ স্ত্রী ও কন্যাদের সতীত্ব রক্ষার জন্য নিজেরাই তাহাদিগকে হত্যা করিয়া ফেলিত। এই রীতি ইসলাম সমর্থিত নয়। তবুও রাজপুতদের সংস্পর্শে আসার দরুন কালক্রমে মুসলমানদের মধ্যেও এই কুসংস্কার ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। পাঠান সৈন্যরা রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া ওসমানের একটি মাত্র কন্যাকে রাখিয়া অবশিষ্ট সব কয়জনকে হত্যা করিয়া রাজপ্রাসাদের চতুষ্পার্শ্বে মাটি চাপা দিয়া রাখিল। ওসমানের কবরও রাজপ্রাসাদের বাহিরে দুই পর্বতের মাঝামাঝি এক নির্জন স্থানে তৈরী করা হইয়াছিল। কিন্তু মোগল বাহিনী যাহাতে তাহার লাশ খুঁজিয়া বাহির করিতে না পারে তজ্জন্য উহা কাহাকেও জানিতে দেওয়া হয় নাই।

পরদিন মোগল বাহিনী ওসমানের রাজধানী উসার আক্রমণ করিল। পাঠানদের শক্তি রহিত হইয়া আসিয়াছিল। কাজেই ওসমানের ভ্রাতা ও পুত্রগণ আত্মসমর্পণ করিল। এভাবে সমগ্র রাজ্য মোগলদের অধিকারে চলিয়া গেল।

মোগল শাসনামলে সিলেট জেলা ঢাকাস্থ বাংলার সুবাদারের অধীনে ছিল। কিন্তু ১৭০৮ সালে যখন রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করা হয় তখন উহার রাজস্ব ব্যবস্থা ঢাকা নিয়াবতের অধীনে আসে। ঐ সময় সিলেট জেলার ফৌজদারের পদটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ, প্রথমতঃ ইহা ছিল সীমান্ত জেলা। ত্রিপুরা, কাছাড় ও জয়ন্তিয়ায় স্বাধীন রাজ্যগুলি ইহার সীমান্তে থাকায় এখানকার ফৌজদারকে বেশ হুঁশিয়ার থাকিতে হইত। অতি বিচক্ষণ ও সাহসী ব্যক্তি ছাড়া কেহই এই জেলার ফৌজদারের পদে সমাসীন হইতে পারিত না। তদুপরি খাসিয়া, কুকী ইত্যাদি কতগুলি পার্বত্য জাতি সীমান্তে বাস করিত বলিয়া প্রায়শঃ ইহারা শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত হইত। ইহাদের দৌরাত্মে অনেক সময় সাধারণ লোক বিপর্যস্ত হইয়া পড়িত। এই সব কারণে

সিলেটে প্রচুর সৈন্য মোতায়েন রাখিতে হইত এবং ফৌজদারকেই তাহাদের সকল দায়িত্ব বহন করিতে হইত।

রাজস্ব আদায়ের ভার থাকিত দেওয়ানের উপর। মোগল শাসনামলে আনন্দ নারায়ণ নামক জনৈক প্রতিভাবান ব্যক্তি সিলেটের দেওয়ান ছিলেন।

দেওয়ানের অধীনে 'কানুন গো'রা কাজ করিত। রাজস্ব-সংক্রান্ত বহু বিষয়ের দায়িত্ব তাহাদিগকে পালন করিতে হইত। রাজস্ব আদায়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাকল্পে ইটা, লংলা, তরফ ইত্যাদি জায়গায় তাহাদের অফিস ছিল। জমি মাপিবার ব্যাপারে আজ-কাল যেমন চেইন ব্যবহার করা হয়, ওসময় তাহা ছিল না। বাঁশের নল দ্বারা তখন জমি মাপার কাজ চলিত।

বিচার কার্যের দায়িত্ব থাকিত কাযীদের উপর। তাহারা মুফতীগণের পরামর্শ ও নিজেদের বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী বিচার করিতেন। বিচার কার্যে ধর্মীয় আইনের অনুসরণ করা হইত। মুফতীগণ ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধীয় আইন কানুন সম্পর্কে অবহিত করিয়া কাযীকে সাহায্য করিতেন আর রাজপণ্ডিতগণ হিন্দু শাস্ত্রের আইন কানুন বাতাইয়া দিয়া সাহায্য করিতেন। এই সকল মুফতী ও রাজপণ্ডিতগণ নবাবের নিকট হইতে জায়গীর ভোগ করিতেন।

মোগল শাসনের প্রথম দিকে ইজারা প্রথা চালু ছিল। কিন্তু নবাব মুরশিদকুলী খাঁ ইজারা প্রথা রহিত করিয়া তথায় জমিদারী প্রথা চালু করেন। জমিদারগণ কিস্তীবন্দী করিয়া রাজস্বের টাকা দেওয়ান খানায় জমা দিতেন। নির্দ্ধারিত সময় রাজস্ব জমা না দিলে তাহাদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করা হইত এবং সময় সময় তাহাদের প্রতি নির্যাতনও চালানো হইত। দশ বছরের মেয়াদে যাহাদিগকে জমিদারী দেওয়া হইত তাহাদিগকে বলা হইত চৌধুরী। কিন্তু পরবর্তীকালে চৌধুরী শব্দটি সার্বজনীন হইয়া যায় এবং প্রত্যেক জমিদার চৌধুরী খেতাবে ভূষিত হয়।

মোগল আমলে 'দাম' নামক এক প্রকার তামার মুদ্রার প্রচলন ছিল। উহা দেখিতে অনেকটা বৃটিশ আমলের ডবল পয়সার মত। দাম অপেক্ষা কম মানের মুদ্রাগুলিকে বলা হইত দাম্‌ড়ি। আট দাম্‌ড়িতে এক দাম ও চল্লিশ দামে শেরশাহী একটাকা হইত।

মোগল আমলে জিনিস পত্রের দাম খুব কম ছিল। ও সময় এক মন ধান চারি আনা হইতে পাঁচ আনার মধ্যে পাওয়া যাইত। ঘি পাওয়া যাইত প্রতিসের চারআনা হইতে ছয়আনার মধ্যে। ঐ সময় দাস প্রথা চালু ছিল বলিয়া প্রতি অভিজাত পরিবারে অন্ততঃ দুই একজন দাস দাসী থাকিত। দিন মজুরও পাওয়া যাইত, তবে তাহাদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। একজন অতি বলবান মজুরের বার্ষিক বেতন বারআনা হইতে একটাকার বেশী ছিল না। জনসংখ্যার তুলনায় দেশের আর্থিক অবস্থা খুবই ভাল ছিল। জন সাধারণ বেশ সুখেই দিন কাটাইত।

ইংরেজ আমলে সিলেটের সামাজিক অবস্থা

অধুনা যুগের মত ঐ সময় যাতায়াত ব্যবস্থা এত সুবিধাজনক ছিল না। লোকেরা পায় হাঁটিয়া তীর্থ যাত্রা করিত। চলার পথে ডাকাতি রাহাজানি প্রায়ই হইত। জলপথে জল দস্যুদের উপদ্রব কমাইবার উদ্দেশ্যে জলপুলিশ নিয়োজিত থাকিত। তাঁহারা কখনও দস্যুদের পাকড়াও করিতে পারিত, কখনও পারিত না।

জমিদারের কাছারীতে যে সব আমলা থাকিত তাঁহারা কায়দায় ফেলিয়া জনগণের নিকট হইতে ঘুষ লইত। বিচারকার্যের জন্য পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। আজকালকার মত লোকেরা এত চালাক ছিল না। তাহারা সত্য-সাক্ষ্য দিত বলিয়া বিচারও সুষ্ঠু ও ন্যায়ভিত্তিক হইত।

দাসপ্রথা তখনও বিদ্যমান ছিল। ধনী মহাজনেরা দাস-দাসী ক্রয় করিয়া নিজেদের সাংসারিক কাজ-কর্ম সমাধা করিত। কোন কোন

লোক দাস ব্যবসায় করিত। তাঁহারা বিভিন্ন স্থান হইতে দাস ক্রয় করিয়া আনিয়া উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিত এবং অধিক মুনাফা লুটিত।

ছেলেমেয়েদের লেখা-পড়ার ব্যবস্থা তখনও ছিল বটে কিন্তু বর্তমান কালের মত এত ব্যাপক নয়। সৌখীন ও ধনী লোকেরাই তখন নিজেদের ছেলেমেয়েদিগকে লেখা-পড়া শিক্ষা দিত। সাধারণ পরিবারের লোকেরা উহার মর্মও বুঝিত না এবং ছেলেমেয়েদিগকে স্কুলেও পাঠাইত না। কি ভাবে পরিশ্রম করিয়া জীবিকার্জন করা যায় ইহাই ছিল তাহাদের শিক্ষার বিষয় বস্তু।

ও সময় কাগজের এত ব্যাপকতা ছিল না বলিয়া ছেলেমেয়েরা বালু ছড়াইয়া সমান করিয়া অঙ্গুলী বা কাঠির সাহায্যে বর্ণমালা লিখিত। এইভাবে যখন তাহাদের বর্ণমালা শেখা হইয়া যাইত তখন তাহাদিগকে কলাপাতায় লেখার অনুমতি দেওয়া হইত। কলাপাতার বিদ্যাও যখন আয়ত্বে আসিয়া যাইত তখন তাহাদিগকে ভুটিয়া কাগজে লিখিতে দেওয়া হইত। যে সব ছেলেমেয়েরা বালু ছাড়িয়া কলাপাতায় লেখার অনুমতি পাইত কিংবা যাহারা কলাপাতা হইতে ভুটিয়া কাগজে প্রোমোশন পাইত তাহাদের আনন্দের সীমা থাকিত না।

ইংরেজ আমলে সিলেটের পুরুষ লোকেরা সাধারণতঃ লুঙ্গি ও চওড়া পাজামা পরিধান করিত। তাহাদের গায়ে থাকিত নিমা কিংবা খোলা চাদর। রাজদরবারে যাওয়ার সময় তাঁহারা আচকান, চাপকান, পাগড়ি ও পায়ে নাগরা জুতা ব্যবহার করিত। ধনী গৃহস্থেরা বাহিরে যাওয়ার সময় ছাতা ও কমপক্ষে দুই এক বেহারা অবশ্যই সাথে নিত। বেহারা ছাতা আগলাইয়া রাখিত এবং ধনী মহাজন তাহার নীচে থাকিয়া হাটিয়া যাইত। মাথায় পাগড়ি, হাতে লাঠি ও সঙ্গে দুই একজন দাস থাকা তখন ভদ্রতার পরিচায়ক ছিল।

মেয়েরা শাড়ী পরিধান করিত। শাড়ীর মধ্যে চন্দ্রকোণা, মেঘডুমুর, রসমণ্ডল, গনপিছ, ছয়নু, কাছিদা ইত্যাদি শাড়ীর বহুল প্রচলন ছিল।

হিন্দু বিবাহিতা মেয়েরা কপালে ও সিঁথিতে সিঁদুর ব্যবহার করিত। তাহারা শাঁখার চুড়িও পরিধান করিত। উহার এক একটি চুড়ি এত মজবুত ও মোটা হইত যে, শ্বাশুড়ী হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েক পুরুষ পর্যন্ত ব্যবহৃত হইত।

মুসলমান মেয়েরা হাতে রূপার চুঁড়ি, গলায় মালা বা হাঁসুলী, কানে কানফুল, মাথায় টিকা ও নাকে নথ ব্যবহার করিত। এই সমস্ত গহনার বেশীর ভাগই হইত রূপার তৈরী। গহনায় কারুকার্যের চাইতে ওজনের গুরুত্বই হইত গৌরবের কারণ। যাহার গহনা যত বেশী ওজনের হইত সে নিজেকে ততই গৌরবান্বিতা মনে করিত।

বিবাহে লাঠি খেলার প্রচলন ছিল। পাত্রপক্ষ ও পাত্রীপক্ষের মধ্যে লাঠি খেলা হইত। যে দল পরাজয় বরণ করিত তাহাদিগকে বিজয়ী দলের অনেক বিদ্রূপ সহ্য করিতে হইত। নিমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দকে খিলিপান পরিবেশন করিতে হইত। এ কাজে খুব সতর্কতা অলবম্বন করা হইত। কারণ পানদানে ঠিকমত পান সাজানো না হইলে নিমন্ত্রণ উপযুক্ত বিবেচিত হইত না।

সিলেটের বানিয়াচুঙ্গ এলাকায় ভাট নামে এক শ্রেণীর লোক বসবাস করিত। ইহাদের পেশা ছিল কবিতা ও বিভিন্ন ধরনের গান রচনা করিয়া গাহিয়া শুনানো। জনগণ ভাটিয়াদের গান শুনিতে ভালবাসিত। এইজন্য সময়ে তাহারা বাজারে এবং সময়ে গ্রামে গিয়া লোকদের গান শুনাইত ও পয়সা উপার্জন করিত।

সিলেটের সাহা সম্প্রদায় অনেকটা সম্মানের অধিকারী ছিল। তাহাদের ধনী লোকেরা উচ্চবর্ণের হিন্দু ছেলেদিগকে টাকার লোভ দেখাইয়া তাহাদের নিকট মেয়ে বিবাহ দিতে চাহিত। যে সব ছেলে টাকার লোভে সাহার মেয়ে বিবাহ করিত তাহারা কুলাঙ্গার বলিয়া বিবেচিত হইত। নিজেদের কুলে আর তাহারা ফিরিয়া যাইতে পারিত না।

অসতী মেয়েদের জন্য চরম শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। যে সব মেয়ে নারীধর্ম বিসর্জন দিয়া ব্যভিচারে লিপ্ত হইত, ধরা পড়িলে তাহাদের

মাথা নেড়া করিয়া দিয়া ও গালে চুন কালি মাখিয়া কুল ত্যাগ করিতে বাধ্য করা হইত।

সিলেটে কমবেশী সকল মেয়েরাই চরকা দিয়া সূতা কাটিত। বিধবা মেয়েরা এ কাজে অগ্রণী ছিল। যে সব মেয়ে অকালে স্বামী হারা হইয়া অসহায় হইয়া পড়িত, তাহারা চরকায় সূতা কাটিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত।

ইংরেজ আমলে জিনিসপত্র খুব সস্তা ছিল। মাসে এক টাকা খরচ করিলে একজন লোক সচ্ছল ভাবে জীবিকা নির্বাহ করিতে পারিত। দুধ প্রতি সের দুই পয়সায় ও ঘি প্রতি সের ছয় আনায় পাওয়া যাইত। দেড় মণ চাউলের সর্বাধিক মূল্য ছিল এক টাকা। আট আনা হইতে বার আনা বেতন দিলে একজন চাকরকে একমাস রাখা যাইত। জমির মূল্যও খুব কম ছিল। এক কেদার জমির সর্বোচ্চ মূল্য দশ টাকার অধিক ছিল না। অবশ্য ইহা ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকের কথা। শেষের দিকে জিনিস পত্রের মূল্য অনেকটা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু তা' এত বেশী নয়, যা বর্তমান কালের মত মানুষেয় ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে। সাধারণ লোকেরা খাইয়া পরিয়া মোটামুটি সচ্ছল ভাবেই জীবন ধারণ করিতে পারিত।

মোহার্রমের দাঙ্গা

১৭৮২ খৃষ্টাব্দে সিলেটের মুসলমানগণ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ঐ সময় সিলেটের কালেক্টর ছিলেন রবার্ট লিণ্ডসে। দাঙ্গা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে হিন্দুগণ আসিয়া লিণ্ডসেকে জানায় যে মোহর্রম-পর্ব উপলক্ষে মুসলমানগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে এবং তা'র সূচনা হইবে হিন্দুদের একটি মন্দির ভাঙ্গার মাধ্যমে। লিণ্ডসে এ ব্যাপারে কোনরূপ পূর্বলক্ষণ দেখিতে পান নাই বলিয়া তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া বিদায় দিলেন।

লিণ্ডসের সিপাহীরা জেলার সর্বত্র ছড়াইয়া রহিয়াছিল। শহরে ছিল মাত্র ৪০/৫০ জন সিপাহী। মোহার্রমের দিন বিকাল ৫টা পর্যন্ত কোনরূপ দুর্ঘটনা ঘটিল না। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা হিন্দুদের দেবমন্দির হইতে পূজার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিতেই মুসলমানগণ প্রথমে দেওয়ান মানিক চাঁদের মন্দির ও পরে অন্যান্য মন্দিরগুলির উপর আক্রমণ চালাইল। লিণ্ডসে কতিপয় বন্দুকধারী সৈন্য লইয়া দ্রুত ঘটনাস্থলে গমন করিলেন। এবং তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু মুসলমানগণ নিরস্ত হইল না। তাহাদের দলপতি পরিষ্কার ভাষায় তাহাকে বলিয়া দিলেন—"আমরা ফিরিঙ্গীর হুকুম মানি না, ফিরিঙ্গীর চেহারা দেখিতে চাই না।" এই বলিয়া দলপতি নিজেই তাহাকে তরবারি দ্বারা আঘাত করিলেন। লিণ্ডসে উহা তরবারি দ্বারা প্রতিরোধ করিলেন। অতঃপর তিনি দলপতিকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িলেন। দলপতি ভূপাতিত হইলেন। কিন্তু তাহার লোকেরা তবু একচুল হটিল না। ফলে সিপাহীরা ব্যাপক আকারে গুলি ছুড়িতে লাগিল। বহুলোক ঘটনাস্থলেই প্রাণত্যাগ করিল এবং বহুলোক আহত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইল।

এই বিদ্রোহ পরিচালনার নেতা কে ছিলেন, তাহার নাম জানা যায় না। তবে লিণ্ডসের গুলিতে দলপতিদ্বয় যে টিলার উপরে শাহাদত বরণ করিয়াছিলেন, তাহা আজও হাদা মিয়া ও মাধা মিয়ার টিলা নামে পরিচিত। এই হেতু ধারণা করা হয় যে, তাহাদের নাম সৈয়দ হাদী ও সৈয়দ মাহ্দী হইবে।

সিপাহী বিদ্রোহ ও লাতুর লড়াই

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এই বিদ্রোহের মূল লক্ষ্য ছিল বাংলার মাটি হইতে ইংরেজ শাসনের চির অবসান। বিদ্রোহ শুরু হয় দিল্লী হইতে, কিন্তু ইহার ঢেউ বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সিলেটেও উহার যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল।

চট্টগ্রামের তিনশত সীমান্তরক্ষী সৈন্য বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া ট্রেজারী লুট করতঃ কুমিল্লা জেলার মধ্য দিয়া সিলেটে প্রবেশ করে। তাহারা লংলা পরগনার জমিদার গাওস আলী খাঁর নিকট হইতে জবরদস্তিমূলক রসদপত্র সংগ্রহ করিয়া ক্রমাগত সিলেট শহরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। মেজর বিং এই সংবাদ পাইয়া তাহাদের গতি প্রতিরোধ কল্পে সিলেট হইতে প্রতাপগড়ের দিকে অগ্রসর হইলেন। লাতু বাজারের নিকটবর্তী একস্থানে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। বিদ্রোহীরা মালগড় টিলার উপরে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছিল, ইংরেজরা ছিল নিম্নভূমিতে। তাই প্রথম দিকে যুদ্ধের গতি বিদ্রোহীদের পক্ষেই রায় দিয়াছিল। মেজর বিং বিদ্রোহীদের প্রথম গুলিতেই নিহত হন। তাহার পাঁচজন সৈন্যও বিদ্রোহীদের গুলিতে নিহত হয়। ইহার পর বিং এর সৈন্যরা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পলায়ন করিতে শুরু করিলে সুবাদার অযোধ্যা সিংহ আগাইয়া আসেন। তাহার অপূর্ব রণনৈপুণ্যে বিদ্রোহীরা পশ্চাত হটিতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত রণে ভঙ্গ দিয়া কাছাড় জেলায় পালাইয়া যায়। ইহাই সুবিখ্যাত লাতুর যুদ্ধ নামে পরিচিত।

সিলেটে ধর্মীয় আন্দোলন

সুদীর্ঘকাল ইংরেজ শাসনের ফলে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে নানারূপ কু-সংস্কার ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। হিন্দু-সংস্কৃতির প্রভাবে অনেক মুসলমান প্রভাবিত হইয়া পড়িয়াছিল। মুসলমানগণ একদিকে নামায রোযা ইত্যাদি ইসলামী আচারগুলি পালন করিত। অন্যদিকে তাহারা হিন্দুদের পূজা উৎসবেও যোগদান করিত। সারা বাংলাদেশে যখন মুসলমানদের এই অবস্থা, তখন জৌনপুরের হযরত মাওলানা কেরামত আলী সাহেব (রহঃ) বাংলাদেশে আগমন করেন ও

বিভিন্ন অঞ্চলে সভাসমিতি করিয়া মুসলমানদের কাছে ইসলামের সত্যিকার রূপরেখা তুলিয়া ধরেন। হযরত মাওলানা সাহেব নিজে একজন কামেল ওলীও ছিলেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রভাব সারা বাংলাদেশের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কাল তিনি বাংলাদেশের জনগণকে হেদায়াত করিয়াছিলেন। সিলেট জেলায়ও তিনি পদার্পণ করিয়াছিলেন। সিলেটের বিভিন্ন এলাকায় তঁার খলীফারা হেদায়াত কার্যে লিপ্ত ছিলেন। বহু ভক্তপ্রাণ মুসলমান তাঁহার শিষ্যত্ব অর্জন করিয়া হেদায়াতের আলোকে আলোকিত হইয়াছিলেন।

১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী "তরীকায়ে মোহাম্মদী" নামে একটি ধর্মীয় আন্দোলন শুরু করেন। তাঁহার এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় প্রেরণা জাগরিত করিয়া তাহাদিগকে আত্মসচেতন করিয়া তোলা। তাঁহার এই আন্দোলনের ঢেউ সিলেট জেলায়ও প্রবেশ করিয়াছিল। বহুলোক সিলেট হইতে কলিকাতায় গিয়া সৈয়দ সাহেবের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করিয়াছিল। সিলেটে যিনি তরীকায়ে মোহাম্মদী প্রচার করেন তাঁহার নাম জয়নাল আবেদীন। তিনি হায়দ্রাবাদের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার প্রচারের ফলে সিলেটের বহু লোক এই আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিল। সিলেটের উরদু কবি আশরাফ আলী মজুমদারও ইহাতে যোগদান করেন। আরবের আবদুল ওহাব নামক জনৈক প্রখ্যাত আলেম এই আন্দোলনের প্রধান হোতা ছিলেন বলিয়া ইহাকে ওহাবী আন্দোলনও বলা হয়।

খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

১৯২০ সালে সমগ্র সিলেট জেলায় খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ ছড়াইয়া পড়ে। স্বাধীনতা অর্জন করাই ছিল ইংরেজ সরকারের সাথে অসহযোগ আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য।

সারা বাংলাদেশে যখন এই অবস্থা, তখন সিলেটের কানাইঘাটে ইংরেজ সরকারের এক কু-কীর্তি সমগ্র দেশবাসীকে অধিকতর ক্ষিপ্ত ও বিস্মিত করিয়া তোলে। ঘটনা ছিল এই :—

১৯২২ সালে সুরমা ভেলীর কমিশনার ছিলেন জে, ই, ওয়েষ্টার। ঐ বছর কানাইঘাট মাদরাসার বার্ষিক সভায় বহু আলেম, শিক্ষাবিদ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যোগদান করিয়াছিলেন। যেহেতু এই সভা ছিল মুসলমানদের ধর্মীয় রাজনৈতিক প্রেরণার উৎস, সেহেতু ইহার উপর ইংরেজ সরকারের ক্রোধদীপ্ত-কড়ানজর পতিত হইয়াছিল।

সভার কাজ যখন পূর্ণোদ্যমে চলিতেছিল তখন ওয়েষ্টারের আদেশে পুলিশেরা ব্যাপকভাবে গুলি চালাইতে শুরু করিল। হঠাৎ এইরূপ ঘটনার জন্য কেহই প্রস্তুত ছিল না। তাই ছয়জন লোক ঘটনাস্থলেই নিহত হইল এইং বহুলোক আহত হইল। শুধু তাহাই নহে—ইহার পর পুলিশেরা সমগ্র কানাইঘাটে ব্যাপক ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করিয়া রাখিল। বহু লোককে তাহারা গ্রেফতার করিল, অনেক নিরপরাধ লোকের গৃহে খানাতল্লাসী চালাইয়া হয়রান করিয়া তুলিল।

ইহার ফলে সমগ্র সিলেট জেলায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে চরম অসন্তোষ ও ঘৃণার ভাব বিস্তার লাভ করে।

ওসময় সারাদেশে অসহযোগ আন্দোলন চলিতেছিল। সিলেটে যদিচ এ আন্দোলনের ঢেউ লাগিয়াছিল তবুও এই ঘটনার পূর্ব পর্যন্ত উহা তেমন জোরদার হইয়া উঠে নাই।

ঘটনার সত্যিকার বিবরণ অবগত হইবার জন্য কলিকাতা হইতে মহাত্মাগান্ধী, মাওলানা মোহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকাত আলী, সরোজিনী নাইডু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখ রাজনীতিবিদগণ সিলেটে আগমন করিলেন। তাহাদের আগমনের ফলে সিলেটে অসহযোগ আন্দোলন তীব্রতর হইয়া উঠিল।

সমাপ্ত

আমাদের প্রকাশিত

মকছুদোল মো'মেনীন বা বেহেশ্‌তের কুঞ্জী ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড (সাদা নিউজ) 0 নেয়ামুল কোরআন (সাদা/নিউজ) 0 মে'রাজুছ ছালেকীন 0 মরণের বিভীষিকা 0 তাবীজাতে রহমানী 0 ছবির সাহায্যে হজ্জ ও যিয়ারত 0 "মা" আমেনা 0 হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) 0 হযরত ফাতেমা যোহ্‌রা (রাঃ) 0 হযরত রহীমা (রাঃ) 0 তাপসী রাবেয়া বসরী (রহঃ) 0 হযরত বিবি [illegible] হাবেরা 0 হযরত খাদীজা (রাঃ) 0 হযরত বিবি মরিয়ম 0 হযরত বিবি আছিয়া 0 হযরত মুসা (কালিমুল্লাহ) 0 গাওছুল আযম হযরত বড়পীর (রহঃ) 0 হযরত শেখ সা'দী (রহঃ) 0 হযরত মনছুর হেল্লাজ (রহঃ) 0 হযরত খাজা খিজির (আঃ) 0 খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রহঃ) 0 হযরত ওয়ায়েছ করনী (রহঃ) 0 হযরত শাহ্‌ জালাল ও শাহ্‌ পরাণ (রহঃ) 0 হযরত বায়েযীদ বোস্তামী ও শাহ আমানত (রহঃ) 0 হযরত বেলাল (রাঃ) 0 হযরত নিযামুদ্দীন আওলিয়া (রহঃ) 0 হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও নমরূদ 0 হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) 0 হযরত ওমর (রাঃ) 0 হযরত ওসমান (রাঃ) 0 হযরত আলী (কাঃ) 0 বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে মে'রাজ 0 ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) 0 ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) 0 ইমাম মালেক (রহঃ) 0 ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) 0 বাংলাদেশের সুফী সাধক ও অলী আওলিয়া 0 মোসলেম সতী-সাধ্বী 0 পরলোক দর্শন 0 আট বেহেশ্‌ত সাত দোযখ 0 নীরাতে সাহাবা 0 কাছাছোল আম্বিয়া 0 খাছায়েলুল আম্বিয়া 0 রহমানী (দঃ) 0 ওফাতুন্নবী বা বিশ্বনবীর তিরোধান 0 ইয়াজিদ-কারবালা হাসান-হোসায়েন 0 শাহনূর বাংলা অভিধান (সাদা/নিউজ) 0 সোলেমানী খাবনামা ও ফালনামা 0 শাহ্‌নূর কোরআন শরীফ (তিন রঙে) 0 কবীরগঞ্জের বারচাঁদ 0 বেহেশ্‌তের পথ 0 মিলাদে মাহবুব 0 সহজ নামায শিক্ষা 0 ইউছুফি খাবনামা (ছোট/বড়) 0 গুলশানে মদিনা গজল 0 ছেরাজুল মোস্তাকীম 0 বক্তৃতা শিক্ষা 0 এছাড়াও প্রকাশের পথে রয়েছে আরও অনেক...............

রহমানিয়া লাইব্রেরী

৩১, নবরায় লেন, ঢাকা—১

আমাদের প্রকাশিত

মকছুদোল মো'মেনীন বা বেহেশ্‌তের কুঞ্জী ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড (সাদা নিউজ) 0 নেয়ামুল কোরআন (সাদা/নিউজ) 0 মে'রাজুছ ছালেকীন 0 মরণের বিভীষিকা 0 তাবীজাতে [illegible] 0 ছবির সাহায্যে হজ্ব ও যিয়ারত 0 "মা" আমেনা 0 হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) 0 হযরত ফাতেমা যোহ্‌রা (রাঃ) 0 হযরত রহীমা (রাঃ) 0 তাপসী রাবেয়া বসরী (রহঃ) 0 হযরত বিবি হাযেরা 0 হযরত খাদীজা (রাঃ) 0 হযরত বিবি মরিয়ম 0 হযরত বিবি আছিয়া 0 হযরত মুসা (কালিমুল্লাহ্) 0 গাওছুল আযম হযরত বড়পীর (রহঃ) 0 হযরত শেখ সা'দী (রহঃ) 0 হযরত মনছুর হেল্লাজ (রহঃ) 0 হযরত খাজা খিজির (আঃ) 0 খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রহঃ) 0 হযরত ওয়ায়েছ করনী (রহঃ) 0 হযরত শাহ্ জালাল ও শাহ্ পরাণ (রহঃ) 0 হযরত বায়েযীদ বোস্তামী ও শাহ আমানত (রহঃ) 0 হযরত বেলাল (রাঃ) 0 হযরত নিযামুদ্দীন আওলিয়া (রহঃ) 0 হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও নমরূদ 0 হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) 0 হযরত ওমর (রাঃ) 0 হযরত ওসমান (রাঃ) 0 হযরত আলী (কার্রাঃ) 0 বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে [illegible] 0 ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) 0 ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) 0 ইমাম মালেক (রহঃ) 0 ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) 0 বাংলাদেশের সুফী সাধক ও অলী আওলিয়া 0 মোসলেম সত-সতী 0 পরলোক দর্শন 0 আট বেহেশ্‌ত সাত দোজখ 0 সীরাতে সাহাবা 0 তাজকেরাতুল আম্বিয়া 0 খাতেমুল আম্বিয়া 0 মহানবী (দঃ) 0 ওফাতুন্নবী বা বিশ্বনবীর তিরোধান 0 ইয়াজিদ-কারবালা হাসান-হোসাইন 0 শাহনুর বাংলা অজিফা (সাদা/নিউজ) 0 সোলেমানী খাবনামা ও ফালনামা 0 শাহ্ নূর কোরআন শরীফ (তিন খণ্ডে) 0 ফজীলতে বারচাঁদ 0 বেহেশ্‌তের সন্ধান 0 মিলাদে মাহবুব 0 সহজ নামায শিক্ষা 0 ইউছুফি খাবনামা (ছোট/বড়) 0 গুলশানে মদিনা গজল 0 ছেরাজুল মোত্তাকীন 0 বক্তৃতা শিক্ষা 0 এছাড়াও প্রকাশের পথে রয়েছে আরও অনেক...............

রহমানিয়া লাইব্রেরী

৩১, নবরায় লেন, ঢাকা—১

আমাদের প্রকাশিত

মকছুদোল মো'মেনীন বা বেহেশ্তের কুঞ্জী ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড (সাদা/নিউজ) 0 নেয়ামুল কোরআন (সাদা/নিউজ) 0 মো'জাযুছ ছালেকীন 0 মরণের বিভীষিকা 0 তাবীজাতে রহমাহ্ 0 ছবির সাহায্যে হজ্ব ও যিয়ারত 0 "মা" আমেনা 0 হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) 0 হযরত ফাতেমা যোহ্রা (রাঃ) 0 হযরত রহীমা (রাঃ) 0 তাপসী রাবেয়া বসরী (রহঃ) 0 হযরত বিবি হাযেরা 0 হযরত খাদীজা (রাঃ) 0 হযরত বিবি মরিয়ম 0 হযরত বিবি আছিয়া 0 হযরত মুসা (কালিমুল্লাহ্) 0 গাওছুল আযম হযরত বড়পীর (রহঃ) 0 হযরত শেখ সা'দী (রহঃ) 0 হযরত মনছুর হেল্লাজ (রহঃ) 0 হযরত খাজা খিজির (আঃ) 0 খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রহঃ) 0 হযরত ওয়ায়েছ করনী (রহঃ) 0 হযরত শাহ্ জালাল ও শাহ্ পরাণ (রহঃ) 0 হযরত বায়েযীদ বোস্তামী ও শাহ আমানত (রহঃ) 0 হযরত বেলাল (রাঃ) 0 হযরত নিযামুদ্দীন আওলিয়া (রহঃ) 0 হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও নমরূদ 0 হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) 0 হযরত ওমর (রাঃ) 0 হযরত ওসমান (রাঃ) 0 হযরত আলী (কার্রাঃ) 0 বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে মে'রাজ 0 ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) 0 ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) 0 ইমাম মালেক (রহঃ) 0 ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) 0 বাংলাদেশের সুফী সাধক ও অলী আওলিয়া 0 মোসলেম সত্ত-সতী 0 পরলোক দর্শন 0 আট বেহেশ্ত সাত দোজখ 0 সীরাতে সাহাবা 0 তাজকেরাতুল আম্বিয়া 0 খাতেমুল আম্বিয়া 0 মহানবী (দঃ) 0 ওফাতুন্নবী বা বিশ্বনবীর তিরোধান 0 ইয়াজিদ-কারবালা হাসান-হোসায়েন 0 শাহনূর বাংলা অজিফা (সাদা/নিউজ) 0 সোলেমানী খাবনামা ও ফালনামা 0 শাহ্ নূর কোরআন শরীফ (তিন খণ্ডে) 0 ফজীলতে বারচাঁদ 0 বেহেশ্তের [illegible] 0 মিলাদে মাহবুব 0 সহজ নামায শিক্ষা 0 ইউছুফি খাবনামা (ছোট/বড়) 0 গুলশানে মদিনা গজল 0 ছেরাতল মোস্তাকীম 0 বক্তৃতা শিক্ষা 0 এছাড়াও প্রকাশের পথে রয়েছে আরও অনেক..................

রহমানিয়া লাইব্রেরী

৩১, নবরায় লেন, ঢাকা—১